স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ১ এপ্রিল - ২০১৩।। ১৮ চৈত্র - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে নির্যাতিত হিন্দুদের সমস্যার সমাধান করুক সরকার : আর এস এস

গুজরাট : সংঘাত নয়, সমঝোতা চাই

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

দু'দফার বদলে তিন বা চার দফায় ভোট হলে
আপত্তিটা কোথায়? □ গূঢ়পুরুষ □ ৮

গুজরাটে লোকায়ুক্ত নিয়োগ : সংঘাত নয়
সমঝোতা চাই □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ৯

খোলা চিঠি : তোষণ ভালো, শোষণও ভালো,
নাটক তো বেজায় ভালো □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

আর এস এসের প্রতিনিধি সভার প্রস্তাব □ ১২

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত
চলছে : আর এস এস □ ১৪

স্বাবলম্বী বিকাশের জন্য বিকল্প অর্থব্যবস্থা জরুরী □ ভাইয়াজী যোশী □ ১৮

ভাবনা-চিন্তা : সবুজ বিপ্লবের কানাগলিতে □ গোপীনাথ দে □ ২০

মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বাধ্যায় □ নীলমণি চক্রবর্তী □ ২১

পৌরাণিক নগর মণিপুর □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২২

ভারতের প্রথম ফায়ার উইমেন □ ইন্দিরা রায় □ ২৬

পরিবারতন্ত্র বজায় রাখতে নতুন ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন
উদ্‌গ্রীব রাজকুমার □ স্বামীনাথন আইয়ার □ ২৭

বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে মাছের চারা আসছে □ ২৯

তিরুপতি মন্দিরের ২৭ লক্ষ টাকা দামের ঘড়ি □ ৩০

অন্যচোখে : নেত্রীর সুশাসনে বিউটি স্পট দেগঙ্গা, কুলপী, গার্ডেনরীচ,
ক্যানিং □ চৈতন্য বর্ধন □ ৩১

অন্যরকম : নৌকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা □ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ সুস্বাস্থ্য : ৩৫
□ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ খেলা : ৩৯
□ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ১৮ চৈত্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ১ এপ্রিল - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬
হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রতিবেশী দেশ কখনও পাল্টায় না। ভৌগোলিক কারণে পাশেই থাকে। তাই তাদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক রেখে চলতে হবে— একটা দেশের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তা ভাববার বিষয়। সম্প্রতি প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে আমাদের উদ্বেগ বাড়ছে। এই প্রসঙ্গেই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ— প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা ও ভারত।

।। সত্বর কপি বুক করুন ।।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
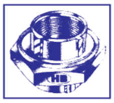
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
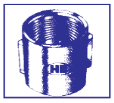
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক জালিয়াতি

সুইস ব্যাঙ্কে গোপনে অ্যাকাউন্ট বহু দূরের প্রশ্ন। এইবার কালোকে সাদা করিবার চক্রে ঘরের ব্যাঙ্কের সিঁদ কাটিয়া গলিয়া গিয়াছে হাজার হাজার কোটি টাকা। বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যখন আন্দোলন চলিতেছে তখন আবিষ্কৃত হইল এখন হইতে আর বিদেশে নয়, দেশের বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিতেও গোপনে সুইস খাতা খোলা যাইতে পারে। দেশে নানা আইন রহিয়াছে, ব্যাঙ্কগুলিরও অসততা রুখিবার নানা আইন রহিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরষের মধ্যে ভূতও রহিয়াছে। যেভাবে বিদেশের ব্যাঙ্কে কালো টাকা জমা রহিয়াছে সেই একই ভাবে এদেশের কিছু বেসরকারী ব্যাঙ্কে কালো টাকা জমা হইতেছে। কেন্দ্রের আর্থিক সংস্কারের পরিকল্পিত রূপ এইটি। আগামী দিনে আরও বেসরকারী ব্যাঙ্ক ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইতে থাকিবে এবং দেশের মধ্যেই কালো টাকার পাহাড় সুরক্ষিত রাখিবার দায়িত্ব লইবে। শুধু তাহাই নয়, সরকারি ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লোপাটের ঘটনাও ঘটিতেছে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হইতেছে রাজ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ১২০ কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা। ইহা ছাড়া নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা হাতানোর চক্রও সক্রিয় পশ্চিমবঙ্গে। মূলত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করিয়া নেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে টাকা সরাইয়া নেয় অপরাধীরা। অপরদিকে চিটফাণ্ডের রমরমার ফাঁদে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে মানুষ। অনেক ছোট বড় কোম্পানি বাজার হইতে টাকা তুলিয়া উধাও হইয়া যাইতেছে। আইনের ফাঁকফোকরের সুযোগ লইয়া এই কাজ চালাইতেছে কোম্পানীগুলি। গ্রামাঞ্চলের মানুষদের ভুল বুঝাইয়া তাঁহাদের টাকা প্রতারণা করিতেছে সংস্থার মালিকেরা। টাকা লইবার সময় বলা হইতেছে ছয়মাসে তাহা দ্বিগুণ করিয়া ফেরত দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভব কি? আমাদের রাজ্যে চিটফাণ্ডের প্রতারণায় পূর্বেও বহু মানুষ প্রতারিত হইয়াছিলেন। 'সঞ্চয়িতা' নামে একটি কোম্পানি বহু মানুষের টাকা লোপাট করিয়াছিল। এই ঘটনা হইতেও মানুষ শিক্ষা লাভ করে নাই। আজ বহু চিটফাণ্ড রমরমা করিয়া চলিতেছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যসরকার এই ব্যাপারে নিশ্চুপ। সব থেকে ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতেছে চিটফাণ্ডের নামে টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহা জঙ্গী কার্যকলাপে ব্যবহৃত হইতেছে। হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের ঘটনায় জঙ্গীদের টাকার জোগান লইয়া কপালে চিন্তার ভাজ পড়িয়াছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। দীর্ঘদিন ধরিয়াই সন্ত্রাসবাদীদের করিডর হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকাই এই চিন্তার মূলে। সম্প্রতি রাজ্য সি আই ডি-র সঙ্গে সল্টলেকের আরক্ষা ভবনে একটি দীর্ঘ বৈঠকে বসিয়াছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ কর্তারা। ওই বৈঠক হইতেই একদিকে যেমন সি আই ডি-কে চোরা চালানকারীদের ওপর নজর রাখিতে বলা হইয়াছে, তেমনই রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়াইতে বলা হইয়াছে। নজর রাখিতে বলা হইয়াছে কয়েকটি চিটফাণ্ডের কার্যকলাপের ওপরও। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সন্দেহ সীমান্ত এলাকায় চিটফাণ্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ জেহাদী কার্যকলাপেও ব্যবহৃত হইতেছে। উল্লেখ্য গত মাসেই রাজ্য সি আই ডি ও কলকাতা পুলিশের থেকে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের বেঙ্গল মডিউল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এন আই এ-র এসিপি নীতীশ কুমার। ওই বেঙ্গল মডিউলের কেউ বেনামে বা অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের টাকার জোগান দিয়াছেন কী না সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা পাইতে চাহিতেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সে প্রসঙ্গেই জানা গিয়াছে চিটফাণ্ডগুলির ভূমিকাও এক্ষেত্রে ধোয়া তুলসি পাতা নয় বরং কয়েকটি চিটফাণ্ডের ভূমিকা এক্ষেত্রে সন্দেহজনক।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থ ত্যাগ দ্বারাই হতে পারে। স্বার্থের প্রয়োজন নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়—তা তোমারও নয়, আমারও নয়, বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাতে কাজে পরিণত হয়, তার চেষ্টা করো; হে বীরহৃদয় মহান বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নামযশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পিছনে চেয়ো না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কাজ করো।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

তামিলদের রাজনৈতিক অধিকার দিক শ্রীলঙ্কা সরকার : আর এস এস

গত বছর রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদের (ইউ এন এইচ আর সি) জেনেভা বৈঠকের পূর্বে আমরা বক্তব্য রেখেছিলাম যে, শ্রীলঙ্কা সরকার তামিল সমস্যার সমাধান করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের পুনর্বাসন, সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করুন। আমি আজ এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এক বছর গত হয়ে যাওয়ার পরও এই পরিস্থিতির কোনও সংশোধন হয়নি। এই কারণে বিশ্বে শ্রীলঙ্কা সরকারের প্রতি সন্দেহ আরও গভীর হয়েছে। এই সময়ে আমি শ্রীলঙ্কা সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ৩০ বছর ধরে এল টি টি ই ও শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে তামিলদের দুর্দশা চোখ বন্ধ করে দেখা যেতে পারে না। কেননা এর ফলে তামিলরা তাদের জীবন, রোজগার, ঘর-বাড়ী ও মন্দির সবই হারিয়েছে। এক লক্ষেরও বেশি তামিল শ্রীলঙ্কা থেকে পালিয়ে এসে তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলে শরণার্থীরূপে বাস করছে।

আমাদের সুনিশ্চিত মত এই যে, শ্রীলঙ্কায় স্থায়ী শান্তি তখনই সম্ভব, যখন ওই দেশের সরকার শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে এবং ভারতে বসবাসকারী তামিল শরণার্থীদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য গভীরভাবে ও যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করবে। আমরা ভারত সরকারের কাছে এই আগ্রহ করছি যে, শ্রীলঙ্কা সরকার উদ্বাস্তু তামিলদের পুনর্বাসন ও পূর্ণ নাগরিকত্ব ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার জন্য দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

ভাইয়াজী যোশী

আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, ভারতমহাসাগরস্থিত এই প্রতিবেশী দেশ, যার সঙ্গে ভারতের হাজার-হাজার বছরের পুরনো সম্পর্ক, কোনও বিশ্ব শক্তির যুদ্ধ ক্রীড়নক হয়ে ভারতমহাসাগরের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয়। ওই দেশের সিংহলী ও তামিলদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা যেন সফল না হয়। এর মধ্যেই শ্রীলঙ্কার সঙ্কটের স্থায়ী সমস্যার সমাধান নিশ্চিত।

দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এবার বীরাপ্পা মইলি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বারংবার ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া সেই শব্দবন্ধনীগুলোই আবার লিখতে হচ্ছে, কংগ্রেসী দুর্নীতির দীর্ঘ তালিকায় এবার নবতম সংযোজন হলো পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বীরাপ্পা মইলির নাম। অভিযোগ— কর্পোরেট সংক্রান্ত মন্ত্রী থাকার সময় তাঁর পরিবার নিয়ন্ত্রিত ট্রাস্টের পেছনে একটি কর্পোরেট দৈত্য সংস্থা বহু টাকা ঢেলেছে। পুরো ঘটনাটিকে মইলির ক্ষমতার অপব্যবহার আখ্যা দিয়ে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপিসহ সমস্ত বিরোধী দল। এর কোনও প্রতিক্রিয়া অবশ্য পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। মইলির পরিবার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাটির নাম কিষাণ সভা ট্রাস্ট এবং কর্পোরেট দৈত্যটি হলো বিখ্যাত সিগারেট সংস্থা আই টি সি। দিল্লীর দ্য পাইওনীয়ার সংবাদপত্রের সৌজন্যে মইলি পুত্র হর্ষের তার ব্যবসায়িক সহযোগী পি সুধীরকে পাঠানো একটি ই-মেল প্রকাশ্যে এসেছে। যে ই-মেল বার্তায় হর্ষ মইলি লিখেছেন, "সুধীর, বাবা (বীরাপ্পা) আমায় এইমাত্র ফোন করেছিলেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে আগামী ৫ বছরের জন্য কিষাণ সভা ট্রাস্টের যাবতীয় খরচ যোগাতে স্বীকৃত হয়েছে আই টি সি। ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষের জন্য কর্ণাটক ও চিকাবল্লারপুরের সমস্ত আর্থিক বিলগুলো তৈরি করে অতি দ্রুত তাঁদের কাছে পাঠাতে হবে। যাতে তাঁরা আমাদের পেমেন্টের কাজ শুরু করতে পারেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিও।" এই ই-মেল বার্তাতেই প্রাক্তন কর্পোরেট সংক্রান্ত মন্ত্রীর প্রভাব খাটানোর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। অভিযোগ উঠেছে দরিদ্র, অনাথ ও স্কুল ছুট ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মইলির পরিবার নিয়ন্ত্রিত ট্রাস্টটি পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আই টি সি ৬ কোটি টাকা অনুদান দেয়। বার্ষিক ৮ শতাংশ সুদে যার থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান হয়ে যাবে। যদিও মইলির পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে, '৬ কোটি নয়, পাওয়া গিয়েছে মাত্র ৪২ লক্ষ টাকা।' মইলি কিংবা মইলি পুত্র বিষয়টাতে নীরবতা বজায় রাখার জন্য ঘটনাটা যে ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে তাতে সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত ইউপিএ সরকারের আরেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও বিশ্বাসযোগ্য রূপ পাচ্ছে।

ভারতের পুনর্বাসন নীতির সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসবাদী রপ্তানী করছে আই এস আই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০৯ সালে জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার প্রস্তাবিত সন্ত্রাসবাদীদের মূল ধারায় ও ভারত ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে আসার বিষয়টিকে ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রক ২০১০ সালে সবুজ সিগন্যাল দিয়েছিল। যদিও রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়ের মনোনীত প্রস্তাবটিতে একটি জরুরি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল— 'শুধুমাত্র সেই সব পাকিস্তান প্রত্যাগত সন্ত্রাসবাদী সরকারি নীতির বিশেষ সুবিধাগুলির অধিকারী হতে পারবে যারা সরকার নির্ধারিত ৪টি বিশেষ পথ দিয়ে ভারতে ঢুকবে।'

সংবাদসূত্রে প্রকাশ সরকার গৃহীত এই পথগুলি হলো— (১) পুঞ্চ-রাওয়ালকোট, (২) উরি-মুজ্জাফরাবাদ। উল্লেখ্য এই দুটি প্রবেশ দ্বারই LOC বা লাইন অফ কন্ট্রোলের মধ্যে পড়েছে। অপর দুটি ব্যবস্থা হলো সরাসরি ইন্দিরা গান্ধী বিমান বন্দরে সঠিক পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে ঢোকা বা পাঞ্জাবের ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই চারটি প্রবেশ পথের ব্যবহারই পাকিস্তান সরকারের অনুমতি সাপেক্ষ। প্রথম দু'টির ক্ষেত্রে POK (পাকিস্তান অক্যুপায়েড কাশ্মীরের) কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পারমিটের প্রয়োজন। অন্য দুটি রাস্তায় ফিরতে গেলে পাকিস্তানি সরকার প্রদত্ত পাসপোর্ট ও ভিসা জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গত সপ্তাহে নেপাল গোরখপুর সীমান্তে দিল্লী পুলিশের হাতে ধরা পড়া সন্ত্রাসবাদী লিয়াকত আলী শার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী যে সন্ত্রাসবাদীদের এক সময় পাকিস্তান নিজের হাতে পাসপোর্ট বানিয়ে ভারতে দুষ্কর্ম করতে পাঠিয়েছিল, দীর্ঘদিন নাশকতা কর্মের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, আজ তাদেরই সুড়সুড় করে আবার ভারতে ফিরে যাওয়ার বৈধ ছাড়পত্র দেওয়া মানে নিজেদের অপরাধকেই বৈধতা দেওয়া; তাই এই পদ্ধতিতে তারা আদৌ ইচ্ছুক নয়। সে কারণে এই প্রথায় কাগজপত্র জোগাড় করে ভারতে ফেরাও বেশ দুষ্কর।

ফলস্বরূপ ভূতপূর্ব সন্ত্রাসবাদীদের গরিষ্ঠাংশই যেন তেন প্রকারে নেপাল বা বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে উপত্যকার পুলিশকে তাদের পৌঁছনো সংবাদ দিচ্ছে। ভিন্ন পথে আসার আইন মোতাবেক সুবিধেগুলি থেকে বঞ্চিত হলেও সরকার মানবিক কারণেই তাদের মূলস্রোতে ফেরার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে উপত্যকায় ফিরিয়ে নিচ্ছে। পদ্ধতিটি শুনতে আপাত নিরীহ মনে হলেও দেশের তদন্ত সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন অন্য আশঙ্কা ব্যক্ত করে আসছে। তাদের মত অনুযায়ী এই মানবিক আচরণের সুযোগ নিয়ে চির-কুচক্রী আই এস আই ভাল মানুষের ছদ্মবেশে নতুন করে টাটকা সন্ত্রাসবাদী ভারতে চালান করে দেওয়ার মতলব করেছে। সংস্থার কাছে এই মর্মে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে বলে প্রকাশ। দিল্লী পুলিশের বয়ান অনুযায়ী আসন্ন হোলির উৎসবে রাজধানীতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটাবার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই লিয়াকত সীমান্ত পেরিয়ে গোপনে ভারতে আসার চেষ্টা করছিল। দিল্লী পুলিশের এই অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছে লিয়াকতের পরিবার, এমনকি জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশের তরফেও লিয়াকতের পরিবারকেই সমর্থন জানানো হয়েছে। কাশ্মীর পুলিশের তথ্য অনুযায়ী লিয়াকত ২০১০ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতে আত্মসমর্পণ করতে ঢুকছিল। তাদের আরও অনুমান ২০১০-এর পুনর্বাসন নীতির মধ্যেই ভূত ঢুকে রয়েছে।

শ্রীনগরে নিরাপত্তা বাহিনী টহল দিচ্ছে।

দিল্লী পুলিশের বয়ান অনুযায়ী পূর্ব উল্লেখিত সরকার নির্ধারিত চারটি পথ ছাড়া অন্য কোনও দিক দিয়ে কেউ ভারতে ঢুকলেই তাকে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী বলেই গণ্য করা হবে। এই সূত্রে উল্লেখনীয়, ইতিমধ্যে ১৯৯০ সালে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়া ২৪১ জন ভূতপূর্ব সন্ত্রাসবাদী যারা ভারতে ফিরে এসেছে তাদের কেউই সরকার নির্দেশিত পথে ফেরেনি।

দু'দফার বদলে তিন বা চার দফায় ভোট হলে আপত্তিটা কোথায়?

দু' দফায় রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট করার সিদ্ধান্তে তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনড়। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রায় ৬০ হাজার আসনে দু' দফায় ভোট গ্রহণ অসম্ভব। অসম্ভব বলছি, কারণ পঞ্চায়েতের ভোট হবে ব্যালটে। তাও আবার ত্রিস্তরের জন্য পৃথক ব্যালটে। এতে একটি ভোট দিতে যে সময় লাগবে 'ইভিএম' মেশিনে সেই সময়ে কমপক্ষে পাঁচটি ভোট দেওয়া যায়। রাজ্য বিধানসভার ২৯৪টি আসনের জন্য ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা সত্ত্বেও ভোট হয়েছিল পাঁচ দফায়। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপত্তি করেননি। বরং উল্লসিত হয়েছিলেন। অথচ সেই একই ব্যক্তি মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে ফরমান দিচ্ছেন দু' দফায় পঞ্চায়েতের ৬০ হাজার আসনের ভোট করতেই হবে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন না কেন মুখ্যমন্ত্রী এমন অনমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছেন। দু' দফার বদলে তিন বা চার দফায় ভোট হলে মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর দলের আপত্তিটা কোথায়। আপত্তির কারণগুলিই বা কী। এর জবাব তৃণমূল সরকার রাজ্যবাসীকে দিচ্ছেন না। কেন? এই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের আসল মতলবটি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। রাজ্যের তিন প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস, বিজেপি এবং বামফ্রন্ট নির্বাচন কমিশনের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামবে। প্রয়োজনে বিরোধীরা হাইকোর্টে মামলাও করবেন। ঠিক এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হোক সেটাই চাইছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোট নির্ধারিত সময়ে হোক তা চাইছেন না তিনি। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা রিপোর্ট জানিয়েছে, প্রতিটি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসে গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে এপ্রিলে বা মে মাসে ভোট হলে দল চূড়ান্ত বিপর্যয়ে পড়বে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রধান মীরা পাণ্ডে কমিশনের সাংবিধানিক অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কমিশন হাইকোর্টে গেলেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ওপর ইনজাংসান জারি হবে। সেক্ষেত্রে ভোট বেশ কয়েক মাস স্থগিত হবে। বর্তমানে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু আছে তার মেয়াদ মে মাসেই শেষ হয়ে যাবে। তখন রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম চালু রাখতে জেলা শাসক ও বিডিওদের মাথায় রেখে সরকারি নিয়ন্ত্রক কমিটি গড়ে দেবে। এই কমিটিতে বশংবদ আমলারা ছাড়াও জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে স্থানীয় তৃণমূল নেতারাই যে থাকবেন সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী রাজ চলবে তৃণমূলের দলতন্ত্রের নির্দেশে। মুখ্যমন্ত্রী এমনটাই চাইছেন। তাই নির্বাচন কমিশনকে আদালতে যেতে প্ররোচনা দিচ্ছেন।

গূঢ়পুরুষের

কলম

রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুসারে ২৬ ও ৩০ এপ্রিল রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটি মুর্শিদাবাদ, মালদা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভোট হবে দ্বিতীয় দফায় অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল। রাজ্যের বাকি সমস্ত জেলায় ভোট হবে ২৬ এপ্রিল। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ওই তিনটি জেলায় কংগ্রেস এবং সিপিএম দলের সমর্থকরা হাঙ্গামা চালাতে পারে। একই সঙ্গে সুব্রতবাবু বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নেই। রাজ্যবাসী সুব্রতবাবুর কোন কথাটা বিশ্বাস করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বামফ্রন্টের আমলে মোট সাতবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। এরমধ্যে ছ'বার নির্বাচন হয়েছে একদিনে। তখন রাজ্য নির্বাচন কমিশন আপত্তি জানায়নি কেন? এই যুক্তি মেনে নিলে বলতে হয় অতীতে সারা দেশেই একসময় ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়াই ভোট হয়েছে। পরে ভোটে জালিয়াতি রুখতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধান টি এন শেষন পরিচয়পত্র ব্যবস্থা চালু করেন। এখন ভোটার কার্ড ছাড়া নির্বাচনে ভোট দেওয়া যায় না। কেউ কি বলে যে অতীতে যদি পরিচয়পত্র ছাড়াই ভোট দেওয়া যেতো তবে এখন কেন যাবে না। বামফ্রন্টের আমলে পঞ্চায়েত ভোট কেমন হোত সে' কথা সবাই জানেন। রাজ্যের মানুষ জানতে চায় সিপিএমের দেখানো পথেই কী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল চলতে চায়। বামফ্রন্টের দলতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতেই ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতায় বসিয়ে ছিলেন। তাই প্রতিটি অন্যায় কাজের সমর্থনে বাম জমানায় নজির তুলে ধরাটা এক ধরনের বিশ্বাসভঙ্গ ছাড়া অন্য আর কিছু নয়।

বিরোধী নেত্রী থাকাকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি মিটিংয়ে বলতেন, সিপিএমের কমরেডরা সবাই লুটেপুটে খাচ্ছে। কথাটা মিথ্যা অপবাদ নয়। তখন তৃণমূল নেত্রী বলতেন, আমরা ক্ষমতায় এলে সব তদন্ত হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পর তিনি ভুলেও সেই শিকেয় তুলে রাখা তদন্তের কথা একবারের জন্যও বলেননি।

গুজরাটে লোকায়ুক্ত নিয়োগ

সংঘাত নয়, সমঝোতা চাই

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

গুজরাটে লোকায়ুক্ত পদে নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল-মন্ত্রিসভার মধ্যে বিরোধটা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। পদটা নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে খালি পড়ে থাকার পর রাজ্যপাল কমল বেনিওয়াল সম্প্রতি এ. আর. মেহ্‌তাকে এই পদে নিযুক্ত করেছেন মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়াই। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাইকোর্টে এই নিয়োগের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেখানে দুজন মাননীয় বিচারপতির রায় দুই রকম হওয়ায় বিষয়টা গিয়েছিল সুপ্রীম কোর্টে।

১ জানুয়ারি সুপ্রীম কোর্ট এই বিষয়ে যে রায় দিয়েছে, সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বোচ্চ আদালতের মতে, মন্ত্রিসভার অমতে বা তাঁকে না জানিয়ে রাজ্যপাল ওই পদ পূরণ করেছেন— এটা সত্যি নয়। কারণ রাজ্যপাল রাজ্যের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন এবং পদের আলোচনা সম্বন্ধে ক্যাবিনেট অবহিত ছিল। তাছাড়া পদটা খালি রাখা হয়েছিল নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে। সুতরাং নিয়োগটা অবৈধ বা অন্যায় নয়।

কিন্তু একই সঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট রাজ্যপালেরও নিন্দা করেছে— কারণ তিনি 'misjudged her role', তিনি তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন।

বলা বাহুল্য, পুরো ব্যাপারটা কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সেই জন্য এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

আমাদের সংবিধান রচয়িতারা বৃটেনের ধাঁচে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন কেন্দ্রে ও রাজ্যে। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট ক্যাবিনেটের পরামর্শে ও সাহায্যে চলবেন। তার কারণ হলো— ক্যাবিনেটের কাজই হচ্ছে 'to aid and advise।' সেই অর্থে স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল নামমাত্র বা নিয়মতান্ত্রিক শাসকমাত্র। বুরে জবালা কাপুর বনাম পাঞ্জাবের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট জানিয়েছিল যে, তাঁদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা নেই— তাঁরা মোটামুটিভাবে ক্যাবিনেটের

রাজ্যপালেরও উচিত ছিল সংঘাতের পথে না গিয়ে এই ব্যাপারে অন্য ভাবে এগনো। এই পদে কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার ব্যাপারে ক্যাবিনেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন, এই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাতে পারতেন।

পরামর্শেই চলবেন। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম মুখ্য সচিবের মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিল যে বৃটিশ আমলের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আর রাজ্যপালের নেই, তিনি নামমাত্র শাসক হিসেবে ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুসারেই রাজ্যশাসন করতে বাধ্য।

তবে এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, আমাদের সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল সব ক্ষেত্রে তাঁর মন্ত্রিসভার মত বা পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য নন। তাৎপর্যের বিষয় হলো— ১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যপাল কিছু ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ না নিয়ে কাজ করতে পারেন, কারণ তাঁকে এর দ্বারা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা 'discretionary power' দেওয়া হয়েছে— 'he may have to use his own wisdom or discretion'— (ড. এস. সি. কাশ্যপ, আওয়ার কনস্টিটিউশান, পৃ. ২১৪)। তার অর্থ হলো— রাজ্যপাল স্বাভাবিক অবস্থাতে ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুসারে চললেও কিছু ক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন সংবিধান অনুসারেই। তাৎপর্যের বিষয় হলো— কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বেশি এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, সেটা তাঁর ওপরেই সংবিধান ছেড়ে দিয়েছে। আরও বড় কথা— এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না (এস. এল. সিক্রি— ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২২৮)।

ডঃ বিদ্যাধর মহাজন মনে করেন— মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ, তাঁর পদচ্যুতি, বিলে স্বাক্ষরদান, বিধানসভা ডাকা ও ভেঙে দেওয়া, রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করা ইত্যাদি

ব্যাপারে রাজ্যপাল তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন— (দ্য কন্সটিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২২০)। তবে, এটা ঠিক যে, এই ধরনের তালিকা তৈরি করা যায় না— কারণ ব্যাপারটার অনেক খানিই নির্ভর করে রাজ্যপালের ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। ডঃ জে সি জোহারী জানিয়েছেন যে, রাজনৈতিক জটিলতার ফলে তাঁর এই ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটতে পারে (ইন্ডিয়ান গর্ভনমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২২৮)।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের ১৫৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কার্যভার গ্রহণের আগে রাজ্যপালকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটা শপথ গ্রহণ করতে হয়— তাতে তিনি বলেন, তাঁর কাজ হবে আইন ও সংবিধানকে রক্ষা করা ('preserve, protect and defend the constitution and Law') এবং জনকল্যাণের দিকটা দেখা। তিনি সব সময় ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন— এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দেন না। সুতরাং ক্যাবিনেট যদি তাঁকে সংবিধান-বিরোধী বা জনকল্যাণের পরিপন্থী কোনও পরামর্শ দেয়, তাহলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেই পারেন।

তৃতীয়ত, ১৫৪ ও ১৫৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি (বলা উচিত— কেন্দ্রীয় সরকার) তাঁকে নিযুক্ত ও বরখাস্ত করতে পারেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের 'নির্দেশ' তিনি মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু মন্ত্রীরা তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তি। তাঁরা তাঁকে 'পরামর্শ' দেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রে ও রাজ্যে ভিন্নধর্মী সরকার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনও বিষয়ে কেন্দ্রের 'নির্দেশ' ও রাজ্য-ক্যাবিনেটের 'পরামর্শ' পরস্পর-বিরোধী হতেই পারে এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে ক্যাবিনেটের পরামর্শ উপেক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর ক্যাবিনেটের কিছুই করার থাকে না।

এই সব কারণে বলা যায়— আমাদের সংবিধান মোটামুটিভাবে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনে বিরাট পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই। তাছাড়া সংবিধানের ৪২ তম ও ৪৪ তম সংশোধনের দ্বারা তাঁর ক্ষমতা কিছুটা সঙ্কুচিতও করা হয়েছে। আরও বড় কথা--- রাষ্ট্রপতিকে তাঁর ক্যাবিনেট পার্লামেন্টের সাহায্যে ইম্‌পীচ করতে পারে— সেই ক্ষমতা রাজ্যপালের ক্ষেত্রে রাজ্য-আইনসভার আদৌ নেই। সুতরাং রাষ্ট্রপতির তুলনায় রাজ্যপাল অনেক বেশি সুবিধেজনক অবস্থায় আছেন (ডবলিউ. এইচ. মরিস-জোন্স্‌— গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৮০)।

এই সব কারণে বলা হয়েছে যে, রাজ্যপাল নিছক নামমাত্র শাসক নন— তিনি সব ব্যাপারে ক্যাবিনেটকে অনুসরণ করবেন, এমন কোনও কথাও নেই। প্রখ্যাত সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ডঃ এম. ভি.পাইলী তাই মন্তব্য করেছেন যে, সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্য-শাসনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ('vital role') গ্রহণ করতে পারেন (অ্যান্ ইনট্রোডাকশান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২৬৪)।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে— তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আদৌ স্বৈরাচারী ক্ষমতা নয়, তিনি একনায়কও নন। রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। তাছাড়া তাঁকে সাংবিধানিক সীমা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থাকতেই হবে। তিনি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন যদি তাঁর ক্যাবিনেট সংবিধান ও আইনকে পদদলিত করতে চায় বা জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে। গুজরাটের এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেছে যে, রাজ্যপাল তাঁর রাজ্যের আইনসভা এমন কি পার্লামেন্টের কাছেও দায়ী নন। এক্ষেত্রে তিনি যদি তাঁর ক্যাবিনেটকেও অগ্রাহ্য করে চলেন, তাহলে গণতান্ত্রিক কাঠামোই ভেঙে পড়বে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে--- সংবিধান যখন রচিত হয়, তখন ভারতবর্ষই ছিল কংগ্রেস আর কংগ্রেসই ছিল ভারতবর্ষ— (গ্রেন্‌ভিল্ অস্টিন, দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ৯)। তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল— কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে একই দল ক্ষমতা ভোগ করবে এবং কোথাও কোথাও বিরোধ দেখা দিলে দলীয় স্তরেই তার মীমাংসা হয়ে যাবে।

এই কারণে সংবিধান রচয়িতারা মনে করেছিলেন যে, রাজ্যপালকে কিছু বাড়তি ক্ষমতা দিলেও তিনি নামমাত্র শাসকের মতোই চলবেন। কিন্তু ১৯৬৭ সাল থেকেই দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈচিত্র্য— কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতা, বসেছে বিভিন্ন দল এবং তার ফলে রাজ্যপালের পদটাও বিতর্ক দ্বন্দ্বের মধ্যে চলে এসেছে। কখনও কেন্দ্রের নির্দেশে তাঁরা রাজ্য-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, কখনও বা কেন্দ্রের বিরাগভাজন হয়ে বিদায় নিয়েছেন।

তবে একটা কথা মেনে নিতেই হবে— রাজ্যপাল একেবারে নামমাত্র শাসক নন। কেন্দ্র চাইলে তিনি/তাঁরা অনেকটাই সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। গুজরাটের ক্ষেত্রে বলা যায়— লোকায়ুক্ত পদটা নয় বছর ধরে খালি রেখে ক্যাবিনেট ঠিক কাজ করেনি, এর ফলে রাজ্যপাল সক্রিয়তা দেখানোর সুযোগ পেয়েছেন। তবে রাজ্যপালেরও উচিত ছিল সংঘাতের পথে না গিয়ে এই ব্যাপারে অন্য ভাবে এগনো। এই পদে কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার ব্যাপারে ক্যাবিনেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন, এই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাতে পারতেন।

এই কারণেই সুপ্রীম কোর্ট উক্ত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

তোষণ ভালো, শোষণও ভালো, নাটক তো বেজায় ভালো

মাননীয় ব্রাত্য বসু,
শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনার নাটকের আমি খুব ভক্ত। উইংকেল টুইংকল তো সবাই দেখেছে। আমি আপনারই লেখা কৃষ্ণগহ্বরে আপনার পরিচালনা এবং অভিনয় দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। ইদানীং আপনাদের সরকার এবং আপনি নাট্যকার থেকে শিক্ষামন্ত্রী হওয়া ব্রাত্য বসু যা করছেন তাও কিন্তু এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণ গহ্বর প্রস্তুত করা। শিক্ষাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন তা সত্যিই এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, নাটকে লোকশিক্ষে হয়। আর আপনার মুখ্যমন্ত্রী দেখালেন নাটকে শিক্ষামন্ত্রীও হওয়া যায়। তাই একের পর এক পাঠক্রম থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্র নাটক আর নাটকে ভরে যাচ্ছে। আমি হাততালি দিলাম।

রাজ্য সরকারের চাকরিতে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বিধানসভায় আগেই বিল পাশ হয়েছে। এবার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বিধানসভায় বিল পাশ করল সরকার। এর ফলে রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। সাচার কমিটির সুপারিশকে মর্যাদা দিয়ে রাজ্যের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু অংশের জন্য আগেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বিধানসভায় বিল পাশ করেছিল রাজ্য সরকার। এবার রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্ত সমস্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বিধানসভায় বিল আনলেন আপনি রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে। বিল পাশও হয়ে গেছে। ফলে সংখ্যালঘু অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তপশিলি জাতির জন্য ২২ শতাংশ, উপজাতির জন্য ৬ শতাংশ, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ৭ শতাংশ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর বিশেষ অংশ যা মূলত সংখ্যালঘুদের জন্যই নির্দিষ্ট তার জন্য সংরক্ষিত থাকছে ১০ শতাংশ।

মন্ত্রীমশাই, তোষণ ভালো। ভোট এনে দেয়। মনে রাখবেন শোষণ কিন্তু ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আপনার নেত্রী বলেছেন, এর ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হবে না। সংরক্ষণ চালু হলেও সাধারণ কোটার ছাত্রছাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। কিন্তু সেটা বাড়ানো কি হাতের মোয়া? রাজ্যের তো ভাঁড়ে মা ভবানী। শিক্ষক, অধ্যাপকদের মাইনে দেবেন কোন পয়সায়? স্কুল কলেজের বিল্ডিং হবে কী দিয়ে?

তবে আপনার হাবভাব বলে দিচ্ছে কোনও এক গৌরী সেনের হাত আপনাদের মাথার ওপর আছে।

ক্লাব-ট্লাবকে অনেক পয়সা দিয়েছেন। এবার ধরলেন নাটকের দল। বাঃ বাঃ! আপনারা ঠিক করেছেন, রাজ্যের দুঃস্থ নাট্যদল ও লোকদলগুলির পাশেও দাঁড়াবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের দুঃস্থ নাট্যদল, নাট্যকর্মী, লোকদল ও লোকশিল্পীদের আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। একশটি নাট্যদলকে এই আর্থিক বছরে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান দেবেন। এ ব্যাপারে জেলাভিত্তিক তালিকাও তৈরি হয়েছে। একশ কুড়িজন দুঃস্থ যাত্রাশিল্পীকে সাত হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান দেওয়া হবে। যাঁরা ঝুমুর, ভাওয়াইয়া ছৌ, গম্ভীরা বা আলকাপের মতো শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন, এমন দুশ পনেরজন লোকশিল্পীকেও সাত হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। একশটি লোকদলকে পাঁচ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। পাশাপাশি আর্থিকভাবে সঙ্কটে থাকা, সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত একশ সত্তরজনকে রাজ্য সরকার প্রতি মাসে পনেরশো টাকা করে পেনশন দেবে।

সত্যিই এসব দেখে সিপিএমও লজ্জা পাবে। পার্টি কর্মীদের, অনুগতদের পাইয়ে দেওয়ার অনেক ফন্দি ফিকির ওরা দেখিয়েছে। কিন্তু এত শিল্পীতভাবে পারেনি। আপনারা যেভাবে নাচ, গান, যাত্রা, মেলাকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন তেমনই নাটক শিল্পকেও অর্থ উপার্জনের মাধ্যম করে দিলেন।

দীর্ঘদিন বহু নাট্য দল, বহু শিল্পী, বহু সাহিত্যিক আপোষহীনভাবে দারিদ্র্য এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। কোনও কিছু পাওয়ার জন্য নয়। এবার প্রলোভন দেখিয়ে ব্রাত্যবাবু আপনারা কি অনুগত নাটকের দল, অনুগত সাংস্কৃতিক মণ্ডলী গড়ে তুলতে চাইছেন? তা ভালো। এবার বরং এসবকে একত্রিত করে নাম দেওয়া হবে তৃণমূল সংস্কৃতি। না, থাক আমার দেওয়া নামটা নিতে হবে না। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেক ভালো নাম দিতে পারেন।

নাটকীয় অভিনন্দন
সহ—

— সুন্দর মৌলিক

বিশেষ প্রতিবেদন

আর এস এসের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার প্রস্তাব

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে নির্যাতিত হিন্দুদের সমস্যার সমাধান করুন সরকার

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে প্রতিনিধি সভার উদ্বোধন করছেন মোহনজী।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা গভীর চিন্তা ব্যক্ত করছে যে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অন্তহীন অত্যাচারের পরিণামস্বরূপ বহু সংখ্যক হিন্দু শরণার্থী রূপে ভারতে আসছে। এটা খুবই লজ্জা ও দুঃখের বিষয় যে এই অসহায় হিন্দুরা তাদের নিজভূমি ও ভারত দুইদেশেই অত্যন্ত শোচনীয় জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বাংলাদেশের বৌদ্ধসহ সকল হিন্দু এবং তাদের উপাসনাস্থলে সেখানকার হিন্দুবিরোধী তথা ভারতবিরোধী কুখ্যাত জামাতে ইসলামী সহ বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনগুলির সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা করছে। এই ঘটনাক্রম বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে লাগাতার চলছে। বাংলাদেশের হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘুদের কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও ইসলামিক আক্রমণের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই অত্যাচারে অসহায় অবস্থায় হাজার-হাজার হিন্দু নিজের জীবন ও সম্মান বাঁচানোর জন্য ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে ও অসমে এরকম হাজার হাজার হিন্দু ও বৌদ্ধ চাকমারা কয়েক দশক ধরে শরণার্থীরূপে জীবনযাপন করছে এবং যখনই বাংলাদেশে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় তখন এই সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা পাকিস্তানের হিন্দুদের দুর্দশার বিষয়েও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। সমস্ত প্রাপ্ত খবর থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে পাকিস্তানের হিন্দুরা সুরক্ষা, সম্মান ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত হীন জীবন অতিবাহিত করছে। সেখানে শিখসহ সমস্ত হিন্দুদের উপর নিত্য হামলা এক সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, অপহরণ, বলাৎকার, জোর-জবরদস্তি বিবাহ, হত্যা ও ধর্মস্থান ধ্বংস করা এসব অত্যাচার ওখানকার হিন্দুদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের কোনও সাংবিধানিক সংস্থা তাদের সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে না। পরিণামস্বরূপ পাকিস্তানের হিন্দুরা পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় চাইতে বাধ্য হচ্ছেন।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা ভারতের রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক নেতৃত্বকে ও কেন্দ্রীয় সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, এই অসহায় হিন্দুরা নিজেরা এমন কিছু করেনি যার জন্য তাদের এই ইসলামী অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে মাতৃভূমির দুঃখপূর্ণ ও বিবেকহীন বিভাজনের পরিণামে তাদের এই অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের এই নিরাপরাধ হিন্দুদের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা এই বিভাজন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক রাত্রির মধ্যে তাদের নিজেরই মাতৃভূমি বিদেশ হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা বিড়ম্বনামাত্র যে, তাদের নেতাদের ভুল রাজনীতির ফল নিজের জীবন দিয়ে মিটাতে হচ্ছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের অবস্থা এবং সেখান থেকে আগত শরণার্থীদের বিষয়ে পুনর্বিচার

করুন। সরকার এই বলে বাঁচতে পারবে না যে, এটা ওই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে এ বিষয়ে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছিল যে, দুই দেশেই সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সুরক্ষা ও নাগরিক অধিকার প্রদান করা হবে। ভারতের সংবিধানের কয়েকটি ধারা ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে তথাকথিত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রদান শুধু নয়, বরং তাদের তুষ্টিকরণের সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভারতে তারা আজ জনসংখ্যায়, আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীতে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুরা ক্রমাগত অত্যাচারের ফলে জনসংখ্যা হ্রাস, অসীম দারিদ্র্য, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং উদ্বাস্তু হওয়ার সমস্যায় জর্জরিত। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাজনের সময় হিন্দু জনসংখ্যা যথাক্রমে ২৮ ও ১১ শতাংশ ছিল এবং খণ্ডিত ভারতে ৮ শতাংশ মুসলমান ছিল। আজ যখন ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা ১৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে তখন বাংলাদেশে হিন্দু কমে গিয়ে ১০ শতাংশের কম হয়েছে, পাকিস্তানে ২ শতাংশেরও কম।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার এটা সুনিশ্চিত মত যে, নেহরু- লিয়াকত চুক্তির উল্লঙ্ঘনের জন্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারকে সাবধান করে দেওয়া ভারত সরকারের দায়িত্ব। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর প্রাণ ও সম্পত্তি ধ্বংস করা কেবল ওই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উপেক্ষা করা যাবে না। এই দুই দেশকে ধারাবাহিক ভাবে ভারতে আগত হিন্দু শরণার্থীর বিষয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো প্রয়োজন। ভারতের তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনও শরণার্থী হিসাবে ওই দেশে যায়নি, বরং লক্ষ লক্ষ লোক ওদেশ থেকে এসেছে এবং আসছে।

এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখার পর অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সরকারকে এই অনুরোধ করছে যে, এই দুই দেশের হিন্দুদের সমস্যাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন, কেননা তাদের অবস্থা অন্য দেশের হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতিনিধি সভা সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে যে—

১. বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সরকারের উপর সেখানকার হিন্দুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য চাপ দিন।

২. 'জাতীয় শরণার্থী ও পুনর্বাসন নীতি' তৈরি করে এই দুই দেশ থেকে আগত হিন্দুদের সম্মানজনক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করতে হবে যতক্ষণ তাদের সুরক্ষিত ও সম্মানজনক প্রত্যাবর্তনের স্থিতি না আসে।

৩. বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের জন্য দুই দেশেই ক্ষতিপূরণের দাবি করা হোক।

৪. সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী ও মানবাধিকার সম্পর্কিত সংস্থাগুলি (UNCHR, UNHRC) থেকে এই দাবি করা যে, হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও সম্মান রক্ষার জন্য নিজের ভূমিকা পালন করুক।

প্রতিনিধি সভা বলতে বাধ্য যে, আমাদের সরকারের এই সব শরণার্থীদের প্রতি উদাসীন মনোভাব এই জন্যই যে তারা কেবল হিন্দু। সমস্ত দেশবাসীকে সরকারের এই সংবেদনহীন ও দায়িত্বহীন ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হতে হবে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু এবং শরণার্থীরূপে ভারতে আসা হিন্দুদের সুরক্ষা ও জীবন-যাপনের অধিকার রক্ষার জন্য সমস্ত দেশকে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

নেত্রদান মহাদান

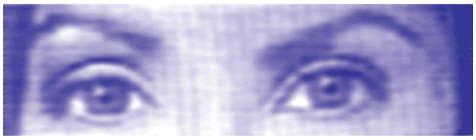

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

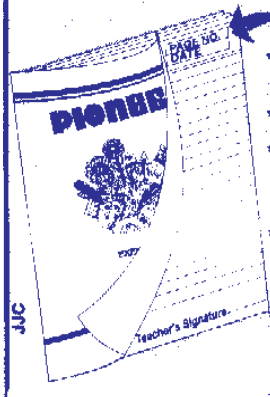

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................. কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত চলছে : আর এস এস

১৫ থেকে ১৭ মার্চ ২০১৩, জয়পুরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে সরকার্যবাহ সুরেশজী যোশী (ভাইয়াজী) সঙ্ঘের যে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন, তা এখানে প্রকাশ করা হলো :

নিত্য সঙ্ঘকাজের দৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ এবং তার জন্য সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গতবর্ষ ২০১২-১৩, সারাদেশে ৫০টি স্থানে ৫২টি সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম বর্ষে ৭৪০৮ স্থান থেকে ১২৫৪৯ শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় বর্ষে ২৩২০ স্থান থেকে ৩০৬৩ জন শিক্ষার্থী এবং তৃতীয় বর্ষে ৯২৩ স্থান থেকে ১০০৩ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১২-১৩ বিশেষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের (৪০ বৎসর থেকে ৬০ বৎসর বয়সীদের জন্য) প্রথম বর্ষে ১২১৮ এবং দ্বিতীয় বর্ষে ৭৬৮ শিক্ষার্থী অংশ নেন।

এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারাদেশে ২৮৭৮৮ স্থানে ৪২৯৮১টি শাখা এবং ৯৫৫৭ স্থানে সাপ্তাহিক মিলন ও ৭১৭৮ স্থানে সঙ্ঘমণ্ডলী চলছে।

এ বৎসর সমস্ত প্রান্তে শাখা বিস্তারের ব্যাপক যোজনা করা হয়েছিল, পরিণামে স্থান ও শাখার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে।

কার্য বিভাগ বৃত্ত

শারীরিক বিভাগ : এ বৎসর সমস্ত শাখার জন্য 'প্রহার যজ্ঞ' কার্যক্রম শারীরিক বিভাগের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল।

এখনও পর্যন্ত ১৫,৯২৪ শাখায় 'প্রহার যজ্ঞ' সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে ১, ৬৬, ৯৫৯ স্বয়ংসেবক অংশ নিয়েছে।

বৌদ্ধিক বিভাগ— প্রতি বৎসরের মতো এবৎসরও চয়নিত ৭৮ জন তরুণ কার্যকর্তার বিশেষ প্রশিক্ষণ বর্গ ভূপালে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচার বিভাগ— ২০১২-১৩ সালে ২৫টি প্রদেশে পত্র লেখার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মোট ২২৪৮ জন যোগ দেন।

সমস্ত দেশে বিভিন্ন ভাষার মোট ৩১টি জাগরণ পত্রিকার মাধ্যমে এক লক্ষ সত্তর হাজার গ্রামে রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয়তাবাদী বিচারধারা পৌঁছাচ্ছে।

বিভিন্ন প্রদেশে সম্পন্ন বিশেষ কার্যক্রম :

দক্ষিণবঙ্গ--- স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার কাছে কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ যুব শিবিরে ২০৫২ স্থান থেকে ৯১১৫ যুবক অংশগ্রহণ করেন।

পূর্ব অন্ধ্র--- গত এক বৎসর ধরে পরিশ্রমের ফসল পূর্ব অন্ধ্রের সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চলের 'হিন্দু চৈতন্য শিবির'। শিবিরে ১৭২৩৩ জন স্বয়ংসেবক ২৪০৪টি গ্রাম থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন। শিবির স্থলে আয়োজিত মাতৃ সম্মেলনে দশ হাজারের বেশি মা-ভগিনী উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম অন্ধ্র--- পশ্চিম অন্ধ্রে 'ঘোষ-তরঙ্গ' নামে একটি ঘোষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৮৬৫ বাদকের সমাপ্তি কার্যক্রমে কলাক্ষেত্রের নামী শিল্পীদের সঙ্গে ৮০০০ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

মালবা— মালবা (মধ্যপ্রদেশের একটি অংশ) প্রান্তের সমস্ত স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণ কার্যক্রমে ইন্দোরে ৩৯৯১ স্থান থেকে ৮৩৩৪৫ জন স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে উপস্থিত ছিলেন। ১০৮টি নগরের সমস্ত এলাকা থেকে প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল। এত বিশাল সংখ্যার উপস্থিতির পরেও ইন্দোর শহরের যাতায়াত ব্যবস্থার কোনও বাধা তৈরি হয়নি যা পুলিশ, প্রশাসন, প্রচার মাধ্যম সকলেই অবাক করেছে।

কর্ণাটক দক্ষিণ— কর্ণাটকের দক্ষিণে ম্যাঙ্গালুর বিভাগে সঙ্ঘকাজের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সরকারি দৃষ্টিতে ম্যাঙ্গালুর একটি জেলা। বর্তমানে এই বিভাগের সমস্ত গ্রামে শাখা অথবা সম্পর্ক আছে। ফেব্রুয়ারী মাসের এই একত্রীকরণে বিভাগের ১৫০০ গ্রামের ১০৮০ গ্রাম থেকে ৮৫৩৪৭ স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে উপস্থিত ছিলেন। ২৭৪ অল্পকালীন বিস্তারক, ৪৫৭ কার্যকর্তার পরিশ্রম ও ১৫০০০ গটনায়কের সক্রিয়তা এই বিশাল কার্যক্রম সফল করে। মালবা ও ম্যাঙ্গালুর কার্যক্রমের বিশেষত্ব ছিল— এখানে কোনও লিখিত সূচনা ছিল না। কেবলমাত্র মৌখিক সূচনা দ্বারাই এত বড় কার্যক্রম সফল হয়।

মহাবিদ্যালয় ছাত্র শিবির, কোঁকন প্রান্ত— স্বামীজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে কোঁকন প্রান্ত মহাবিদ্যালয় ছাত্রদের একটি তিনদিনের শিবিরের আয়োজন করে। ১৪৬৭ জন ছাত্রদের মধ্যে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ৫৪৬ জন, কলেজের ৩২৩ জন, ব্যবসায়িক পাঠ্যক্রমের (মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এল এল বি) ৫৩৫ জন এবং ৬৩ জন স্নাতকোত্তর ছাত্র অংশগ্রহণ করে।

কার্যকর্তা শিবির জয়পুর— সেপ্টেম্বর ২০১২, সরসঙ্ঘচালকজীর উপস্থিতিতে

জয়পুর প্রান্তের দায়িত্ববান ও প্রশিক্ষিত স্বয়ংসেবকদের কার্যক্রম আয়োজিত হয়। শিবিরে ১৯৪৬ স্থান থেকে ৬৯৬৮ সঙ্ঘের কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর তামিলনাড়ু— প্রতি শাখায় সূর্য নমস্কারের একটি বিশেষ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। ৬৭৫ শাখাতে ১০৭২১ জন স্বয়ংসেবক মোট ২,২২,৯৩২ সূর্য নমস্কার করে।

উপরোক্ত সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠনের সামর্থ্য প্রকাশ পায়। ভবিষ্যতের কার্যবৃদ্ধির সংকেত এই কার্যক্রমগুলির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। প্রয়োজন সফল অনুবর্তন (অনুবর্তী প্রয়াস)। এই সমস্ত কার্যক্রমে প্রচার মাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সহৃদয় সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রীয় পরিদৃশ্য

২০১২-১৩ সালে দেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিছু ঘটনা প্রেরণাদায়ী আবার কয়েকটি বিষয়ে সমাজের সর্বস্তরে জাগরণ ও ভাবনা-চিন্তা অত্যন্ত আবশ্যক।

পাক সেনার নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম এক ষড়যন্ত্র :

গত জানুয়ারি মাসে ভারতের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করে ভারতীয় সৈনিকদের উপর পাকিস্তানের বর্বর আক্রমণ কোনও সাধারণ ঘটনা নয়, এটি পাকিস্তান নিয়োজিত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি রচিত একটি ষড়যন্ত্র। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থারও একই মত। শহীদ হেমরাজের মাথা কেটে বাকি শরীর ভারতের সীমান্তে ফেলে দেওয়া পাকিস্তানের বর্বরতার চরম প্রকাশ। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত জিহাদী শক্তি সীমান্তে কতটা তৎপর এই ঘটনায় তা প্রমাণিত। সীমান্তে ভারত বিরোধী শক্তির উপস্থিতি আমাদের দেশের সামনে একটি সমস্যা।

ভারত সরকার এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হিসাবে গ্রহণ করুক। সশস্ত্র এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি সাধারণ মানুষের মনোবলকে ঠিক রাখতে পারবে। ভারত সরকার সময়োপযোগী রণনীতি তৈরি করুক এবং দেশবাসীকে নিজের দেশের সীমান্ত সুরক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করুক।

অনুপ্রবেশ একটি ভয়াবহ চক্রান্ত :

দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে লাগাতার অনুপ্রবেশের কারণে তৈরি সমস্যা আজ ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। রোজগারের নামে ভারতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিক আজ নানাপথে ভারতের নাগরিকত্ব প্রাপ্ত করছে, দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করছে। এমনকি হয়েছে। এর পরিণামে সমর্থকদের সাহায্যে তারা শক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। শুধু ওই ক্ষেত্রেই নয়, মুম্বাই-এর রজা একাদেমীর পরিচালনায় সহিংস জমায়েতের মাধ্যমে দেশবাসীকে খোলা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। রোজগারের কারণে বা শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যাওয়া পূর্বোত্তর রাজ্যের মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিজ রাজ্যে তাড়িয়ে দেবার প্রবল চেষ্টা হয়েছে।

জয়পুরে সাংবাদিক সম্মেলনে সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবোলে (বাঁ দিকে)।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে। কেবলমাত্র জনসংখ্যার পরিবর্তনই নয়। এখানকার হিন্দু সমাজের সামনে এক বড় সমস্যার সৃষ্টি করছে। বিশেষত উত্তর পূর্ব ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ভাবতে বাধ্য করছে যে সমস্ত উত্তর পূর্ব ক্ষেত্রটিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি সুনিয়োজিত ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই ষড়যন্ত্রকে সাহায্য করার মতো মানুষ আমাদের দেশেই রয়েছে।

গত আগস্ট মাসে কোকড়াঝাড়ের ভয়াবহ হিংসার ঘটনা কেবলমাত্র স্থানীয় ঝামেলার কারণে হয়েছিল তা মনে করা ভুল হবে। এটি একটি ব্যাপক ষড়যন্ত্রের অংশমাত্র। অসমে হিংসার ঘটনা অনেক বৎসর ধরেই ঘটে চলেছে। কিন্তু এবার অনুপ্রবেশকারীদের কঠিন প্রতিরোধের সামনে পড়ে কিছু এলাকা খালি করে দিতে পুনে, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও বিবিধ সংগঠনের সদস্যরা উত্তরপূর্ব রাজ্যের মানুষের সুরক্ষা ও অন্যান্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার নামে ভয়াবহ সমস্যাটিকে উপেক্ষা করছে। এখনও পর্যন্ত সীমান্ত বন্ধ করার অথবা বিদেশী নাগরিকদের খুঁজে ফিরিয়ে দেবার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ক্ষমতালোভী রাজনীতি :

কোটি কোটি হিন্দু তথা সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে তথাকথিত সংখ্যালঘু সমাজও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রবাহের অঙ্গ হোক— এই ভাবনা দূর করার পরিবর্তে সংখ্যালঘু তোষণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও মুসলিম ভোটের কথা

মাথায় রেখে 'হিন্দু, গৈরিক, সঙ্ঘ, বিজেপি', এরা সব সন্ত্রাসবাদের প্রতীক এমন অসত্য ও কুৎসিত বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের হিন্দুবিরোধী মানসিকতা প্রকাশ করছে।

হিন্দু সন্ত্রাসবাদ নিয়ে যারা বড় বড় কথা বলছে তারা কিন্তু যারা প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করছে এমন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস হচ্ছে না। বিধানসভার নির্বাচিত সন্ত্রাসবাদী, সাম্প্রদায়িক জনপ্রতিনিধি হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসার জন্য প্রকাশ্যে ভাষণ দিলেও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছে। এটা হলো সংখ্যালঘু তোষণেরই পরিণাম।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত

সন্দেহজনক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়— প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের ব্যাপারে ব্যাপক দুর্নীতির ঘটনা অত্যন্ত নিন্দাজনক। সেনা অফিসারেদের উপর দোষ চাপিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কি নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে? সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অধিকারী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি এমন সন্দেহ দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। এমন বিভেদকারী রাজনীতি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা দেশের পক্ষে অত্যন্ত আতঙ্কজনক।

মহিলা উৎপীড়নের ঘটনা— বর্তমানে মহিলাদের উপর বেড়ে যাওয়া অত্যাচার ও যৌন শোষণের ঘটনায় সমাজ অত্যন্ত ব্যথিত। জীবনদৃষ্টি ও নৈতিক মূল্যের পতনের কারণই এই পরিণাম।

এই বিকৃতিকে কেবলমাত্র পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব অথবা আইনের পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব নয়। কঠোর নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্থাগুলির নিজেদের ভূমিকা কি তার বিচার জরুরী। নৈতিকতাপূর্ণ আচরিত জীবনশৈলী এই সমস্যার একমাত্র সমাধান।

FINS (ফিনস) আয়োজিত 'সীমান্ত তোমায় প্রণাম' :

১৯৬২-এর চীন আক্রমণের ৫০ বছর পূর্ণ হলো। এই যুদ্ধে কার্যত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এই ঘটনা উপলক্ষে Fouram for Intigrated National Security (FINS) একটি দৃষ্টান্তমূলক কার্যক্রমের যোজনা করেছে। দেশের যুবসমাজ নিজের দেশের সীমান্তবর্তী এলাকা একবার স্বচক্ষে দেখুক, সীমান্তবর্তী এলাকার সমস্যা জানুক, ওখানকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে বার্তালাপ হোক, সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে যে সমস্ত সৈনিক অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদা জাগ্রত, তাদের সঙ্গে পরিচিত হোক এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার সঙ্কল্প নিয়ে ফিরে আসুক— এরকম যোজনা নিয়ে 'সীমান্তকে প্রণাম'-এর যোজনা করা হয়। FINS-এর আমন্ত্রণে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এই বিশাল কার্যক্রমকে সফল করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। এই কার্যক্রমের জন্য ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবকদেরই চয়ন করা হয়। সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধি থাকুক এরকম চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে ৫৬৭৯ জন যুবক এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। দেশের ১৫টি রাজ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা যুক্ত হয়েছে এমন সীমান্তে এই সমস্ত রাজ্যের সমস্ত যুবকরা পৌঁছেছেন। নিজের এলাকার পবিত্র জল নিয়ে গিয়ে প্রদান এবং ফিরে আসার সময় সীমান্ত এলাকার পবিত্র মাটি নিয়ে ফিরে আসেন। সীমান্ত এলাকার সমস্ত গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে 'মানব শৃঙ্খলে'র' মাধ্যমে 'সীমা সুরক্ষা সঙ্কল্প' নেওয়া হয়, যাতে ১,০৮,১০৫ জন ভাই বোন অংশ নেন। এই কার্যক্রমকে সফল করার জন্য আনুমানিক ৭৭০০ জন প্রবন্ধক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। যুবসমাজকে দেশের প্রতিরক্ষার প্রতি সচেতন করার দৃষ্টিতে এই কার্যক্রম অতন্ত প্রেরণাদায়ক।

স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ :

সমারোহ সমিতির পরিচালনায় ২৫ ডিসেম্বর ২০১২, সঙ্কল্প দিবসের মাধ্যমেই

সার্ধশত বর্ষের কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত কার্যক্রম হয়েছে তাতে দেশবাসীর সহযোগিতা অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ও প্রেরণাদায়ী। ২৫ ডিসেম্বর ২০১২ **সংকল্প দিবস** পালন করা হয়। এই কার্যক্রম ৯৩৮৫ স্থানে সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এতে ৪,৯৬,৯৬৯ পুরুষ এবং ৯,৭৯,১৫ মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। ১২ জানুয়ারি (২০১৩) স্বামীজীর জন্ম দিবস উপলক্ষে সারাদেশে যে **শোভাযাত্রা** হয় তাতে সমাজের সহযোগিতা অভূতপূর্ব ছিল। হিন্দু সমাজের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু স্থানে অহিন্দু বন্ধুদের সহযোগিতা সত্যিই সামাজিক সদ্ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। সারাদেশে ১৩, ৩৫৩ স্থানে শোভাযাত্রা বের হয়, তাতে ৪৯, ৭০,৪৪৫ জন সম্মিলিত হন। ১৮ ফেব্রুয়ারি সমবেত সূর্যনমস্কার কার্যক্রমে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রী নয়, সমস্ত রকমের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এতে ৩৩০৩৪টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে ৭৩,০৮, ৭৭১ ছাত্র এবং অন্যান্য ৩০, ৬৬, ৬৬১ জন— সব মিলিয়ে মোট ১,০৩,৭৫,৩২৩ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এটি সমাজের কাছে এক দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ।

সার্ধশতবর্ষ সমারোহের কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে ছত্তিশগড় প্রান্তের বোড়লানামক এক বনবাসী গ্রামে 'বিশাল হিন্দু সমাবেশের' আয়োজন করা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ 'মৌনী অমাবস্যা'র' দিন আয়োজিত এই বিশাল হিন্দু সম্মেলনে পরম পুজপাদ শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দ সরস্বতী মহারাজ, পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজী ছাড়াও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এই বিশাল সম্মেলনে ১৫০০ গ্রাম থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার হিন্দু অংশগ্রহণ করেন। হিন্দুত্বের জাগরণ এবং সমস্ত ভেদভাবের ঊর্ধ্বে উঠে সংগঠিত হিন্দু শক্তিই এই ক্ষেত্রের নকশাল উপদ্রব, ধর্মান্তরকরণ ও সামাজিক ভেদভাবের অবসান ঘটাতে পারে। এরকম বিশ্বাস মানুষের মনে জাগ্রত হয়, এই দৃষ্টিতে এই সম্মেলন সার্বিকভাবে সফল।

সার্ধশতবর্ষ সমারোহের ঢেউ শুধু ভারতে নয়, শ্রীলঙ্কাকেও প্রভাবিত করেছে, যেখানে ১০,০০০ লোকের সমাবেশে আয়োজিত 'হিন্দু সম্মেলন' এক অন্য মাত্রা এনে দেয়।

দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় আগামী সমস্ত কার্যক্রম সমাজের সহযোগিতায় সুচারুরূপে সফল হবে। ১৫০ বছর বাদেও স্বামী বিবেকানন্দের বিচারধারার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে দৃঢ়তার সঙ্গে সমাজ নিজের চিন্তাধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরকম সঙ্কেত এই কার্যক্রমের সফলতা থেকেই প্রমাণিত হয়।

কল্যাণী যুব শিবিরে শিবিরার্থীদের একাংশ।

প্রয়াগ কুম্ভ :

প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে বিশাল হিন্দু সমাগমে পবিত্র মহাকুম্ভ সম্পন্ন হয়েছে। এই পবিত্র পরিসরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় মার্গদর্শকমণ্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ত, সন্ন্যাসী-ধর্মাচার্য, মহামণ্ডলেশ্বর, পূজ্য শংকরাচার্যের উপস্থিতি বৈঠকের গরিমা বৃদ্ধি করেছে। সরসঙ্ঘচালকজীও এই বৈঠকে বক্তব্য রেখেছেন। এই বৈঠকে হিন্দু সমাজের সামনে বিদ্যমান বিবিধ সমস্যার গভীর বিচার-মন্থন হয়েছে। বিশেষ ভাবে রামজন্মভূমিতে বিশাল মন্দির নির্মাণের সংকল্প পুনরুচ্চারিত হয়েছে।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০, এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের রায়ে স্পষ্ট, আজ যেখানে রামলালার মূর্তি রয়েছে সেটাই রামজন্মভূমি। পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতো মুসলমান সমাজের উচিত এখন ওই স্থান হিন্দু সমাজের হাতে তুলে দিয়ে মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করা। কিন্তু হিন্দু সমাজের অনুভব যে, মন্দির নির্মাণের পথে বাধা এখনও দূর হয়নি।

মার্গদর্শক মণ্ডল প্রস্তাব গ্রহণ করে মহাজাগরণ ও মহাঅনুষ্ঠানের আহ্বান করেছেন। হিন্দুসমাজ এই অনুষ্ঠান বিপুল ক্ষমতায় সফল করবে এটাই পূজ্য সন্তদের আশা। পূজ্য সন্তসমাজের বিশ্বাস, এই জাগ্রত শক্তি মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করবে।

এ বৎসর আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালন করছি। তাঁর আদর্শ আমাদের প্রেরণা, শক্তি, বল প্রদান করে। তাঁর চিন্তারাশি আমরা নিত্য স্মরণ মনন করি।

স্বামীজী বলতেন--- যখন আমরা অসফল হই, ও তার কারণ বিশ্লেষণ করি তখন আমরা নিরানব্বই শতাংশ বিষয়ে একই সিদ্ধান্ত পৌঁছাই যে, সাধন পদ্ধতির উপর নজর না দেবার কারণেই অসফলতা। প্রয়োজন সাধন পদ্ধতির পুষ্টতা, শুদ্ধতা এবং পূর্ণতার প্রতি নজর দেওয়া। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে সাধন পদ্ধতি পূর্ণরূপে সত্য হলে লক্ষ্য অবশ্যই পূরণ হবে।

আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম আমাদের শাখা ও শাখায় নির্মিত স্বয়ংসেবক। এই মাধ্যম যত পরিপূর্ণ হবে ততই শীঘ্র আমাদের পরম বৈভবসম্পন্ন রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণে সফল হবো।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধি সভায় গত এক বছরে যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

- শ্রীকান্ত যোশী— অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের আমন্ত্রিত সদস্য ও হিন্দুস্থান সমাচারের উপদেষ্টা।
- সুরেন্দ্র সিং চৌহান— অখিল ভারতীয় গ্রাম বিকাশ প্রমুখ।
- বাপুসাহেব কেন্দুরকর— বাণপ্রস্থী কার্যকর্তা।
- ভাইয়াজী গাড়ে— বিদর্ভের প্রবীণ প্রচারক।
- নানাজী যোশী— পূর্ব সংগঠন সম্পাদক, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ।
- নানা লাভে— বিশিষ্ট অক্ষর সংশোধক।
- শারদরাও চৌথাইওয়ালে— নাগপুরের বরিষ্ঠ প্রচারক।
- সদ্‌গুরু জগজিৎ সিং নামধারী।
- স্বামী বালগঙ্গাধরনাথ— আদি চুঞ্চুনাগিরি মঠের সন্ন্যাসী।
- কৈলাশপতি মিশ্র— বিহারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, গুজরাট ও রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও প্রাক্তন প্রবীণ প্রচারক।
- দেবকীনন্দন মাথুর— ভারতবিকাশ পরিষদের কার্যকর্তা।
- সুধীর দাভণ্ডে— 'সক্ষম'-এর কার্যকর্তা।
- প্রফেসর এস আর রাও— বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ।
- বালাসাহেব ঠাকরে— শিবসেনা প্রধান।
- পণ্ডিত রবিশঙ্কর— ভারতরত্ন, বিশিষ্ট সেতারবাদক।
- ঠাকুরদাস বঙ্গ— ওয়ার্ধার সমাজসেবী।
- ইন্দ্রকুমার গুজরাল— প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।
- কে সি পন্থ— প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।
- জিকম রিবা— অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন প্রধান সচিব ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিদ্যাভারতী, অরুণাচলপ্রদেশ।
- ইন্দ্রওয়াদন মোদি— বিশ্ববিখ্যাত ঔষধ নির্মাতা।
- দেবপ্রসাদ বড়ুয়া—গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি।
- শ্রীমতী জাসুবেন শিল্পী— বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী।
- সীতারাম সুতিয়া— আসামের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শ্রীশঙ্করদেব সঙ্ঘের প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।
- প্রয়াগের পবিত্র কুম্ভমেলায় দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়াছেন।
- কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানের অমানবিক ব্যবহারের শিকার ২ জন বীর শহীদ।
- দিল্লীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপীড়িত মহিলা যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন।

এছাড়া জানা-অজানা বন্ধুদের মৃত্যুতে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সমবেদনা প্রকাশ ও বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে।

স্বাবলম্বী আর্থিক বিকাশের জন্য বিকল্প অর্থব্যবস্থা জরুরী : ভাইয়াজী যোশী

সম্প্রতি এক প্রেস বিবৃতিতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশীর বক্তব্য : সরকারের অদূরদর্শিতাপূর্ণ নীতির ফলে বাড়তে থাকা আর্থিক সঙ্কট এবং কৃষি, লঘু উদ্যোগ ও অন্য রোজগার ভিত্তিক ক্ষেত্রের প্রতি বর্ধিত উপেক্ষা আজ দেশের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের উৎপাদনশীল উদ্যোগ বৃদ্ধির মান আজ স্বাধীনতার পর সবচেয়ে ন্যূনতম স্তরে পৌঁছেছে। এর ফলে বে-রোজগারি, নিরন্তর মূল্যবৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি এবং দেশের উদ্যোগ, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উপর বিদেশী কোম্পানির বাড়তি আধিপত্য ইত্যাদি আজ দেশের পক্ষে গভীর আর্থিক সঙ্কট ও পরমুখাপেক্ষীতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইসঙ্গে রাজকোষের সঙ্কটের ফলে কৃষির সঙ্গে সুরক্ষা, বিকাশ ও লোককল্যাণের জন্য পরিকাঠামোর অভাবও আজ গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। কৃষির প্রতি উপেক্ষার জন্য কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা, অধিকাংশ কৃষক কৃষির জন্য ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া এবং সরকারের জমি অধিগ্রহণের বিবেকহীন হঠকারিতার ফলে আজ বহুসংখ্যক কৃষকের জীবন সঙ্কটাপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের খাদ্যসুরক্ষাও গভীরভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এর ফলে বহুজাতিক বাণিজ্যিক চুক্তি এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অর্থব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারকে দেশহিতের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বাধ্য করেছে এবং এক বিকল্পহীনতার স্থিতি দাঁড় করিয়েছে যা অত্যন্ত গভীর চিন্তার বিষয়। এই অবস্থায় স্বাবলম্বী আর্থিক বিকাশের জন্য বিকল্প আর্থিক পুনর্রচনার পদক্ষেপ অবিলম্বে জরুরী।

আজ গঙ্গা-যমুনার মতো পবিত্র নদী আমাদের অপার শ্রদ্ধার কেন্দ্র, কোটি কোটি লোকের জীবন জীবিকার ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের বৃহৎ এলাকার পরিবেশ রক্ষারও মুলাধার। এই নদীগুলির প্রবাহকে অবরুদ্ধ করার সরকারি প্রচেষ্টা, দূষণমুক্ত রাখার প্রতি উদাসীনতা ইত্যাদির জন্য যে জন-আন্দোলন চলছে তার প্রতি উপেক্ষাও গভীর চিন্তার বিষয়। সঙ্ঘ এই সমস্ত জন-আন্দোলনকে স্বাগত জানাচ্ছে। কাবেরী নদীর জল নিয়ে বিবাদও অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। রাজ্যগুলির মধ্যে নদীর জল বিভাজন ব্যাপক জনহিতের জন্য ন্যায়সম্মত ও সৌহার্দ্যপূর্বক হওয়া আবশ্যক। এইভাবে প্রাচীন রামসেতু, যা কোটি কোটি হিন্দুর শ্রদ্ধার কেন্দ্র ও থোরিয়ামের দুর্লভ ভাণ্ডারকে ধ্বংস করে সেতু-সমুদ্রম্ যোজনাকে বাস্তবায়িত করার সরকারি পরিকল্পনাও দেশবাসীর নিকট খুবই বেদনাদায়ক। আগেও জাহাজ চলাচলের জন্য তা ধ্বংসের সরকারী প্রচেষ্টা রামভক্তদের প্রবল বিরোধের কারণে বন্ধ হয়েছিল। আজ পচৌরী কমিশনের পরামর্শ মতো বিকল্প পথ গ্রহণ করার প্রস্তাব সরকার অস্বীকার করে আবার হলফনামা দাখিল তাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এজন্য আমরা সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি যে, জন-ভাবনাকে সম্মান জানিয়ে রামসেতু ভাঙ্গার দুঃসাহস সরকার যেন না করেন। অন্যথায় আবার প্রবল জন- আন্দোলনের সামনে দাঁড়াতে হবে। এরকম সমস্ত ঘটনাক্রমের প্রতি নজর রেখে জনভাবনাকে দেশহিতের জন্য সরকারের ব্যবহার করা প্রয়োজন।

চিঠিপত্র

হিন্দু সন্ত্রাস

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধের সঙ্ঘ পরিবারকে সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা হিসেবে মন্তব্য করার ঘটনা অত্যন্ত কুরুচিকর ও নিন্দনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সঙ্ঘ পরিবারের লাগাতার আন্দোলনের ফলে নিজের ভুল স্বীকার করে অবশেষে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এ ধরনের মন্তব্য অবশ্যই হিন্দু সমাজকে আহত করা, অপমানিত করার সামিল। বস্তুত হিন্দু সন্ত্রাসবাদ শব্দদুটিকে তথাকথিত ক্ষমতালোলুপ স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতারা মাঝেমধ্যেই জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোর অপপ্রচারে ব্যবহার করে থাকেন। এটা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী নেতাদের কৌশলসর্বস্ব রাজনীতির অন্যতম উদাহরণ। তবে হিন্দু সমাজের অপমান হিন্দু ধর্মের পক্ষেও বিড়ম্বনার বিষয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে হিন্দু সমাজই এদেশের মূল স্রোত। এদেশের মুখ্য রাষ্ট্রপ্রবাহ। এদেশের সংস্কৃতি হলো হিন্দু সংস্কৃতি। আর হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী কোনও ব্যক্তি কখনও সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না একথা অনস্বীকার্য। অর্থাৎ হিন্দু-বিদ্বেষী মানসিকতা দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গেই তুলনীয়। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য হিন্দু সমাজের ওপর কলঙ্ক লেপন করার পক্ষে যথেষ্ট। শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করার ঘটনা জেনেশুনে বিষ পান করার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকারি পদে আসীন কোনও ব্যক্তির এধরনের অর্থহীন মন্তব্য ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধাচারণ করা ছাড়া কিছু নয়। আসলে হিন্দু-বিরোধী মন্তব্য এদেশে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এমনকি বিজেপির মতো জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোকে আঘাত করার অন্যতম কৌশল। এধরনের সংগঠনগুলোর কর্মধারাকে স্তব্ধ করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে হিন্দুবিদ্বেষী মানসিকতা প্রকাশ পায়। কিন্তু এধরনের সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের শ্রেণীভুক্ত করার কদর্য প্রচেষ্টা কখনও সফল হয় না। এই ঘৃণ্য মানসিকতায় ভারতীয় সমাজ তথা দেশকে অপদস্থ করা হয়, রাষ্ট্রীয় সমাজকে অবমাননা করা হয়। অথচ মুসলিম, খৃস্টানদের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তথাকথিত এ সকল নেতাদের নেই। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে জড়িত তা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। আর হিন্দু-সন্ত্রাস, গেরুয়াসন্ত্রাস বলে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা চলছে, ভারতের সার্বভৌমত্বকে আঘাত করা হচ্ছে; সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মর্যাদাকে সুরক্ষিত করতে হলে এই অপপ্রচার বন্ধ করা দরকার।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

নারীর সম্মান

শুধুমাত্র আইন করে চরমতম শাস্তি দিয়ে কোনওদিনই সমাজ থেকে নারীর মর্যাদাহানি রূপ কালব্যাধিকে একেবারে দূর করা সম্ভব নয়, যদি মানুষের মধ্যে প্রভূত মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলা না যায়। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে সব মানুষই দেবতুল্য হবে। দুষ্কৃতিদের শাস্তি বিধান অবশ্যই করতে হবে। অর্থাৎ তার সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির দ্বারা মানসিক বিকাশ সাধিত হয় তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

এই কিছুদিন পূর্বে একটি বৃটিশ পত্রিকায় প্রকাশিত এক মনস্তাত্ত্বিকের অভিমত হলো— সম্প্রতিকালে যুবসমাজের মধ্যে মস্তিষ্কে বেশিরভাগ সময় যৌনচিন্তাই তার চারিত্রিক স্খলনের একমাত্র কারণ। মানুষ যদি অধিকাংশ সময় সৎ চিন্তা অর্থাৎ জগত কল্যাণের চিন্তার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে তা হলে তার মধ্যে এইসব কুচিন্তা আসতে পারে না এবং সেও অনেকটা মানবোচিত ব্যবহারে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারবে। বুঝতে পারবে যে নারী কেবল তার যৌন প্রবৃত্তির দাসী নয় ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র নয়। সম্প্রতিকালে মৌলবাদী ইসলাম সম্প্রদায়ের নারীদের প্রতি যে সব ফতোয়া জারি হয়েছে তা মুসলিম নারী সম্প্রদায়কে যে শুধু কূপমণ্ডুক করে রাখবে তা নয়, বিশ্বের নারী জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে তারা অনেক দূরে নিপতিত হবে। তাই আজ নারী ও পুরুষ উভয়ের মেলবন্ধনেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে সক্ষম; তাদের প্রতি অবজ্ঞা বা অবহেলা নয়। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই উন্নতমানের সভ্যতা গঠনের একমাত্র সোপান।

—পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

সবুজ বিপ্লবের কানাগলিতে

গোপীনাথ দে

১৯৬০ এর দশকে খাদ্যের অভাব অনটন রোধ করার জন্য পি এল ৪৮০-র গম আমদানির ব্যাপারটা হয়তো আজও অনেকের মনে আছে। শুধু ভারতে নয়, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলছে খাদ্যের অভাব অনটন। আর সেই সুযোগে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী নরম্যান অর্নেস্ট বোরলগ-এর আবিষ্কৃত উচ্চ ফলনশীল জাতের গম ও ধানের বীজ এবং তার সঙ্গে মারাত্মক রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবসাদাররা যথা ফোর্ড, রকফেলার ফাউন্ডেশন ও নির্দিষ্ট মার্কিন কর্পোরেটগুলি ভারতে তো বটেই, বিশ্বের বাজারে নেমে পড়েছে। আমাদের দেশে যেসব দেশীয় বীজ ছিল তার মধ্যে অনেকগুলোই ছিল প্রকৃত উচ্চ ফলনশীল জাতের। যেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই হারিয়ে গেছে এবং বাকিগুলিও হারাতে বসেছে বোরলগ প্রযুক্তির মনোকালচারের ফলে। সেইসব দেশীয় বীজের মধ্যে যেগুলি ছিল উচ্চফলনশীল, সেগুলি চাষের জন্য স্থানীয় জৈব সার, কীটনাশক, ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট-কন্ট্রোলই যথেষ্ট ছিল। রাসায়নিক ব্যবহার খুব কম দরকার হোত। খরা, বন্যা, তীব্র ঠাণ্ডাতেও ফসল ফলানোর ক্ষমতা ছিল সেসব দেশীয় বীজের। সেগুলো নিয়ে উচ্চতর গবেষণা ও তাদের চাষের এলাকা বাড়িয়ে ও কিছু আমদানির ব্যবস্থা রেখে সমস্যা কি মেটান যেত না? বর্তমানের ডব্লিউ, টি, ও-এর জমানায় বাজার তো মুক্ত হবেই। স্বনির্ভরতার তত্ত্ব বলে আর কিছু থাকবে কি?

বোরলগের গবেষণায় ১৯৪৮ সালে উচ্চফলনশীল গম বীজ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপরে উচ্চফলনশীল ধান বীজ আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে ফোর্ড ও রকফেলার ফাউন্ডেশন বোরলগের বীজগুলি বাজারে আনার ব্যবস্থা শুরু করে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে সেগুলি বিশ্ব বাজারে ছাড়া হয়। পরে ১৯৭০ সালে বোরলগকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। উচ্চফলনশীল বীজ আবিষ্কারের পদ্ধতি ছিল বৈজ্ঞানিক ভাবধারা মেনেই। কিন্তু বিজ্ঞানের কোনও শাখায় এই বিজ্ঞানীকে 'নোবেল' পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। হয়েছিল 'শান্তির' জন্য পুরস্কার। তাহলে কি একটা প্রশ্ন থেকে যায় না যে এই বীজ বিজ্ঞানসম্মত কি না? এবং এও বলা যায় নাকি যে বোরলগের বীজ মার্কিন রাসায়নিক কর্পোরেটের স্বার্থে প্রকৃতপক্ষে কাজ করেছে!

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নরম্যান অর্নেস্ট বোরলগ প্রয়াত হন ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন সবুজ বিপ্লবের তত্ত্বে ভুল ছিল। এবং ভারতে উচ্চফলনশীল ধান ও গম বীজ আমদানী করে এবং বোরলগের পরামর্শে আমাদের দেশে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন যিনি, সেই ডঃ এম এস স্বামীনাথন, তিনিও শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের তত্ত্বে ভুল ছিল। কারণ বোরলগের গবেষণায় উদ্ভূত উচ্চফলনশীল ধান ও গম বীজের দ্বারা চাষে যে পরিমাণ মারাত্মক রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার হয় তার জন্য মাটি, জল ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তার জন্য সমগ্র মানবজাতি সহ জীবজগতই বিপন্ন হয়ে উঠবে। তীব্র বিষ- রাসায়নিকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ছাড়াও, সেচের জন্য জলের হিসাব মাথায় রাখলেও অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে যে পরিমাণ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ ভূগর্ভের জলস্তর যেভাবে নিম্নগামী তা থেকেও আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জলস্তর নেমে গেছে একশ ফুটের নিচে। জলে মিশে যাচ্ছে আর্সেনিক ইত্যাদি। গোটাদেশে ও বিশ্বের চিত্রটাও একই রকম। আমাদের দেশে সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থান পাঞ্জাবের ৩০ শতাংশ কৃষিজমি বন্ধ্যা মরুভূমি হয়ে গেছে। গুরগাঁও সহ বহু জায়গায় জলের রেশন চালু হয়েছে, সপ্তাহে তিনদিনের বেশি জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না। জলের জন্য মানুষ পথে নেমে মারদাঙ্গা করছে। এই হলো সবুজ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল।

ডি ডি টি এর দ্রবণ একসময় মশা মারা ও কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। ১৯৩৯ সালে এর কীটনাশক গুণাবলী আবিষ্কার করেন 'পল মূলার'। ফলস্বরূপ ১৯৪৮ সালে পল মূলার চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। পরে জানা গেল এই ডি ডি টি-র ব্যবহার মারাত্মক ক্যান্সারের কারণ, আর সেই কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে ডি ডি টি।

আর এই কারণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বিজ্ঞানসম্মত ইত্যাদি বলে অনেক কিছু চলছে আমাদের সমাজে বা দেশে কিন্তু সেসবের সুদূর প্রসারি ফলাফল কি হবে তা না দেখে না বুঝে গ্রহণ করাটা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। এত কিছু দেখেশুনেও আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন এবং এখনও সেই ডাকের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। গুরগাঁও এবং পাঞ্জাবের অবস্থা দেখেও যদি আমরা সতর্ক না হই তাহলে চরম সর্বনাশের পদধ্বনি অবশ্যই শোনা যাবে। তবে কি এসবের থেকে মুক্তির পথ নেই? মুক্তির পথ অবশ্যই ছিল এবং এখনও আছে। সেই পথটি তাচ্ছিল্য সহকারে অবহেলা করাটাই হয়েছে কাল।

ভারতবর্ষের সনাতন গো-কেন্দ্রিক কৃষিব্যবস্থা ছিল, যেটা হাজার হাজার বছর ধরে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য। এবং সেই পদ্ধতির কোনও কুপ্রভাব ছিল না, নেইও। তাই সুস্থ সমাজ ও সুস্থ পরিবেশের জন্য দেশজ পদ্ধতিই পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে। দেশজ পদ্ধতির মধ্যেই জৈব সার, কীটনাশক এবং উচ্চফলনশীল বীজ সবই ছিল, এখনও আছে। চা রপ্তানিতে ভারত ছিল প্রথমস্থানে, এখন তৃতীয়স্থানে নেমেছে। কারণ রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার। ভারতের বিখ্যাত ভালো চা ইউরোপের বাজার থেকে ফেরত পাঠিয়েছে, যেহেতু ওই চা-গাছে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে উৎপাদন করা হয়েছে। ইউরোপ সহ আরব রাষ্ট্রগুলিতেও জৈব সার ও কীটনাশক দিয়ে উৎপন্ন ফসল এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে উৎপন্ন ফসল পৃথক পৃথক ভাবে বিক্রি হয় এবং দামও আলাদা-আলাদা।

জৈব সার ও কীটনাশক দিয়ে উৎপন্ন ফসলের দাম অনেক বেশী। এই অবস্থায় পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ডাক আসছে। একবার ভেবে দেখুন।

মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বাধ্যায়

ধর্মজীবনে শাস্ত্র পাঠেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আবার ধর্মশাস্ত্রের পরিধিও বিশাল, বিরাট। কাজেই কোন শাস্ত্রটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় তাহা বোঝাও সহজসাধ্য নয়। এই রূপ দুরূহ কার্য থেকে পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে মহাপুরুষদের নির্দেশাবলীর উপর। এ বিষয়ে কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের বাণী এখানে তুলে ধরা হলো যাতে আমরা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারি :

১. 'ধর্মগ্রন্থ-পাঠ-রূপ সাধনের প্রথম কথা এই 'আমি কোন সম্প্রদায়ের লোক' একথা ভুলিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিবে, সমুদয় শাস্ত্র পাঠ করিবে।'

—সাধন-তত্ত্ব

২. গীতার দু' একটি শ্লোক নিত্য মুখস্ত করবে। সকালে শ্রীমদ্ ভগবদগীতা, গুরুগীতা পাঠ করবে। মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠ করবে।'

—আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

৩.'তুমি তোমার সাধনার অনুকূলে শাস্ত্র দেখ, প্রাণ যাতে জাগিয়ে উঠে সেই শাস্ত্র পড়, যাতে সর্বদা নাম করতে ইচ্ছে হয়— সেই শাস্ত্রের অনুশীলন কর, যে মহাপুরুষের বাণীতে ধমনীতে উৎসাহের স্রোত ছোটে সে মহাপুরুষের বাণী পুনঃ পুনঃ শোন, পড়।'

—সীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথ

৪. 'ভগবদ্‌গীতা পাঠ, অন্ততঃপক্ষে দৈনিক একটি করিয়া শ্লোক মুখস্ত কর।'

—স্বামী ভোলানন্দ গিরি

৫. 'রোজ এক অধ্যায় করে গীতা পাঠ দরকার। আমি নিজে দেখেছি মন যখন নীচে নামে, একটু গীতা পাঠ করলে সেগুলো একেবারে যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়।'

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

৬. 'রোজ এক অধ্যায় গীতা পাঠ করবে।'

—শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী

৭. 'ধর্মগ্রন্থ কি বেশি পড়তে হয়? একখানা পড়লেই যথেষ্ট। তবে মানুষ প্রায়ই impervious—সহজে কথা ভিতরে ঢোকে না। যা ঢোকে তাও অমনি বেরিয়ে যায়। তাই এক কথা বার বার শুনতে হয়।'

—স্বামী পূর্ণানন্দ (হৃষীকেশ)

৮. 'যথাশক্তি গীতা পাঠ করিও।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

৯. 'গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ, বিবেক চূড়ামণি ও কথামৃত পাঠ করিবে। ও তাহা ধারণা করিতে অভ্যাস করিবে।'

—স্বামী অভেদানন্দ

১০. 'যে সমস্ত অতিমানব ও মহামানবগণের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হইয়াছে— তাহাদের সান্নিধ্য বা সঙ্গ সাধারণ মানুষের কাছে চিরদিনই দুর্লভ। সেই অভাব খানিকটা মিটাইবার জন্যই আমাদের সদ্‌গ্রন্থ অর্থাৎ পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণের অমর জীবন কাহিনী ও উপদেশাবলী পাঠ করা উচিত। স্থানকালের ব্যবধান ঘুচাইয়া একমাত্র এইভাবেই আমরা তাঁহাদের উন্নত ভাবধারার আস্বাদ পাইতে পারি।'

—যোগীবর বরদাচরণ মজুমদার

আপনি আচরি ধর্ম :

(ক) 'শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত'— পুনঃ পুনঃ পাঠ করো। আমি ৩২ বার পড়েছি। —আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(খ) মনুষ্য জীবনে যা করা উচিত তা করেছি। এই উদ্দেশ্য ছিল যে জীবনটা বিশুদ্ধ করতে হবে। খুব পড়তুম। আট, নয় ঘণ্টা দিনে। পুরাণ-গ্রন্থ অনেক পড়েছি। শেষে বেদান্তে মন বসে গেল। ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) আমার সঙ্গে পরিহাসাদি করতেন, বলতেন, ''কি গো, কিছু বল বেদান্তের কথা।''

—স্বামী তুরীয়ানন্দ

সংকলক : নীলমণি চক্রবর্তী

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

পরম্পরা

পৌরাণিক নগর মণিপুর

গোপাল চক্রবর্তী

মণিপুর ভারতের পূর্বসীমান্তে অবস্থিত এক পৌরাণিক নগর। বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। এটি ২৩°৫০—২৫°৪ উত্তর এবং ৯০°০—৯৪°৪৭ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে নাগাল্যাণ্ড রাজ্য, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) ও মিজোরাম রাজ্য, পূর্বে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার), পশ্চিমে অসমের কাছাড় জেলা দ্বারা বেষ্টিত। মহাভারতে মণিপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করার পর নিয়ম ছিল, দ্রৌপদী যখন যে স্বামীর কাছে থাকবে তখন অন্য স্বামী যদি তাঁদের কাছে যায় তবে তাঁকে বৎসরকালের জন্য বনবাসে যেতে হবে। একবার দ্রৌপদী যখন অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের কাছে তখন অনবধানে সেখানে প্রবেশ করলেন অর্জুন। শর্ত অনুযায়ী তাঁকে যেতে হলো বনবাসে। বনে বনে ঘুরে তিনি এক সময়ে উপস্থিত হলেন পার্বত্য মণিপুর রাজ্যে। সেখানে রাজা চিত্রভানুর কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন মোহিত হন এবং রাজা চিত্রভানুর কাছে তাঁর পাণি-প্রার্থনা করেন। শর্ত সাপেক্ষে অর্জুন আর মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার বিবাহ হয়। শর্ত হলো এই, ভগবান শিবের বর পেয়েছিলেন এই বংশের নৃপতি প্রভঞ্জন। বর ছিল যে বংশের প্রত্যেক রাজা একমাত্র পুত্র উত্তরাধিকারী রূপে পাবেন। কিন্তু চিত্রভানুর হলো কন্যা সন্তান, চিত্রাঙ্গদাকে তিনি পুত্রের মতো পালন করছেন। অর্জুনকে তিনি শর্ত দিলেন তাঁদের পুত্র হবে মণিপুরের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী রাজা। অর্জুন সম্মত হলেন। তাঁদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। তার নাম রাখা হলো

মণিপুরের প্রসিদ্ধ সাংগাই উৎসব। হরিণের সাজে নৃত্য মণিপুরী রমণীদের।

বভ্রুবাহন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় এই বভ্রুবাহন অশ্বমেধের ঘোড়া ধরে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পিতা অর্জুনকেও বধ করেছিল। নাগকন্যা উলুপীর মৃতসঞ্জীবনী মণির স্পর্শে অর্জুনের পুনর্জীবন লাভ হয়। পিতাপুত্রের মিলন ঘটে। মণিপুরের প্রাচীন রাজবংশ অদ্যাবধি নিজেদের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বংশধর বলে গর্ব অনুভব করেন। প্রাচীনকালে এখানে বহিরাগত কোনও উপজাতি বাস করত। মণিপুর এক পর্বতময় অরণ্যভূমি, এখানকার ভূমির তিন চতুর্থাংশই অরণ্য।

ব্রহ্মদেশের শানদেশীয় এক রাজবংশ মণিপুরে রাজ্য স্থাপন করেছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। ১৭৭৪ সালে 'পাম হাইবা' নামে এক নাগা মণিপুরের রাজা হন। তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে 'গরিব নেওয়াজ' নাম গ্রহণ করেন। পৌরাণিক এই নগরের উপর আঘাত কিন্তু বারেবারেই এসেছে। কিন্তু সব বাধা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে মণিপুর রাজ্যের অস্তিত্ব আজও অক্ষুণ্ণ। 'গরিব নেওয়াজ'-এর মৃত্যুর পর ব্রহ্মদেশ মণিপুর আক্রমণ করে। তৎকালীন রাজা জয়সিংহ ইংরেজদের সহায়তা প্রার্থনা করলে তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের এক সন্ধি স্থাপিত হয় এবং মণিপুর রক্ষা পায়।

১৮৯০ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজ সুরচন্দ্র সিং-এর দুই ভ্রাতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলে তিনি ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা কুলচন্দ্র রাজা হন কিন্তু অপর ভ্রাতা টিকেন্দ্রজিৎই ক্ষমতার অধিকারী হন। ইংরেজ সরকার কুলচন্দ্রকে যুবরাজ বলে স্বীকার করেন এবং টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বেআইনি কাজের জন্য শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ১৮৯১ সালে মণিপুরে পাঠালে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধবিরতি হলে চীফ কমিশনার ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসারগণ আলাপ আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেন। কিন্তু কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়ায় তাঁরা যখন ফিরে আসছিলেন তখন হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে তাদের কয়েকজন গুরুতর রূপে আহত হন এবং বাকি সকলকে বিচারের মাধ্যমে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ইংরেজদের উপর আবার আক্রমণ হলে তারা কাছার থেকে পালিয়ে যান। অতঃপর ব্রহ্মদেশ, কাছাড় ও নাগাপাহাড় এই তিনদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে ইংরেজরা ২৭ এপ্রিল ইম্ফল দখল করে। এবং যুবরাজ ও সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেনাপতি ও অন্যান্য নেতাদের প্রাণদণ্ড এবং যুবরাজসহ অপর সকলকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা হয়। রাজপরিবারের এক বালক চুরাচান্দকে সিংহাসনে বসানো হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৫ সালের জুন মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) সীমান্ত দিয়ে ভারতের পতাকা তুলেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ লড়াই হয়েছিল মণিপুরের মাটিতেই। স্বাধীনতার পর মণিপুর ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

মণিপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকে সবুজ জঙ্গলময় পর্বতের প্রাচীর, মাঝখানে শস্যশ্যামলা উর্বরা নদী উপত্যকা। মণিপুর রাজ্যের মধ্যে ইম্ফল প্রধান নদী। অন্যান্য নদীর মধ্যে ইরিল, খোবল ও নাম্বল নদী কয়েকটি উপত্যকা অঞ্চল বিধৌত করছে। ভৌগোলিকদের অনুমান এই উপত্যকা প্রথমে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল। পরে হ্রদ থেকে নদীর সৃষ্টি হয়ে জল বেরিয়ে যাওয়ায় হ্রদ শুকিয়ে সমতল ভূমির সৃষ্টি হয়। এই অবলুপ্ত হ্রদের অবশিষ্টাংশ 'লোকটাক' হ্রদনামে সুপরিচিত।

মণিপুরের জঙ্গলে হাতি, বাঘ, চিতা, ভালুক, হরিণ, শুকর, গণ্ডার, বাইসন প্রভৃতি জীবজন্তু দেখা যায়। লোকটাক হ্রদ অঞ্চলে প্রচুর বন্য হাঁস, মুরগী পাওয়া যায়। মণিপুরের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিজীবী। এখানকার রেশম ও তাঁত বস্ত্র অত্যন্ত উন্নতমানের। মণিপুর পোলো খেলার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। মণিপুরী টাট্টু ঘোড়া ভারত বিখ্যাত।

অধিকাংশ মণিপুরী নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন এবং উপবীত ধারণ করেন। এদের এক শ্রেণি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নামে পরিচিত।

অপর এক শ্রেণি রাজকুমার নামে পরিচিত। এদের রাজবংশে জন্ম। মণিপুরে সকল বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন আছে। দোলযাত্রা সর্বপ্রধান উৎসব। দুর্গোৎসব, দীপাবলী ইত্যাদি উৎসবেরও প্রচলন আছে। মণিপুরী সনাতনী নৃত্য (রাসনৃত্য) ও লোকনৃত্য ভারত বিখ্যাত। থাবল চোংরা বা বসন্তের নাচ খুবই জনপ্রিয়। ঈশ্বরের লীলা ও বিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক 'লাইহারোবা' এবং প্রেমবিষয়ক থাম্বাথৈবা নাচ (লোকনৃত্য) প্রতি গৃহে শিশুকাল থেকে সকলে শিক্ষা করে।

বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান এবং মিশনারীদের কারণে খৃস্টানদের সংখ্যাবৃদ্ধি মণিপুরীদের চিরন্তন সংস্কৃতির পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

দুই ভূমিকায় সতীশ মান্না

বটকৃষ্ণ মান্নার ঝগড়াটে স্বভাব বদলায়নি কোনও সময়েই। বাড়িতে ঝগড়া করেছে মা-বাবা-ভাইদের সঙ্গে। সবসময় তার বেশি চাই। সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছে, তাকে বেশি না দিলে চেঁচামেচি করবে। তার খিদে বেশি এমন কিন্তু নয়। আসলে সে সবসময় হইহট্টগোল করে সকলের দৃষ্টি তার দিকে আনতে চায়। স্কুলে কয়েকবছর গেছে। কিন্তু মাথায় তার কিছু ঢুকত না। বাবা সতীশ মান্না বলল, 'আমি চাইলুম লেখাপড়া শেখাতে। কিন্তু শেখার জন্যে ধৈর্য লাগে মন দিতে হয়।' বটকৃষ্ণের সেদিকে আদৌ নজর নেই। দারুণ খাটতে পারে। কাজ দিলে করবে ঠিকই কিন্তু আপনমনে বকতে থাকবে। গায়ের জোর আর বুদ্ধি অনেক সময় তাল মেলাতে না পারায় গোলমাল বাড়ে। ঠোঁটকাটা লোক বলে কেউ ভালোচোখে দেখে না। বটকৃষ্ণর বউ অবশ্য অন্যরকম। সে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে চায়। সে বলে, 'ওরা ভাইয়ে-ভাইয়ে লাঠালাঠি মারপিট করুক যতখুশি। আমরা জায়েরা অন্য বাড়ি থেকে এসেছি, কেন ঝগড়া করতে যাবো!' বটকৃষ্ণের বউ গায়ত্রীর কথায় যুক্তি থাকায় তার জায়েরা মেনে নিয়েছে। শ্বশুর সতীশ বলে, 'আমার চারটে ছেলে চাররকম অবতার। বউমা-রা ভালো।' বটকৃষ্ণ মেজ ছেলে। বড়ছেলে কার্তিক একটু ঠাণ্ডা মেজাজের। সেজছেলে বিশ্বনাথ ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ করে না।

ছোটোছেলে কাশীনাথ ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। একই ক্লাসে তিনবার পরীক্ষায় ফেল করার পর স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। বাবার টালির কারখানায় ম্যানেজারি করতে ঢোকে। ছোটো ছেলেকে ম্যানেজার করায় বটকৃষ্ণ চটে গেল বাবার উপর। সে অন্য জায়গায় কাজ করতে গেল। কার্তিক আগেই গিয়েছিল দূরে বেরাদের কারখানায় কাজ করতে। বিশ্বনাথ কিছু না বললেও তাকেও বাড়ি তৈরির জন্যে তিরিশ হাজার ইঁট প্রয়োজনীয় কাঠ আর টালি দিয়েছিল। কার্তিকও একই পরিমাণ পেয়েছে। তবে বড়োছেলেকে অনেকটা দূরে থাকার জায়গা দিয়েছে। বটকৃষ্ণ বেশি ইঁট নিয়েছে। কাঠ টালিও। সতীশ আর তার বউ ছোটোছেলের কাছে থাকে বলে কাশীনাথ পেয়ে গেছে একটা বেশি অংশ।

সতীশ মান্নার ছেলেবেলা থেকেই মুখ সবসময় খোলা থাকে। সেজন্যে লোকে বলে 'হাঁ-করা সতীশ।' তাড়াতাড়ি বললে সেটা দাঁড়ায় 'হাংরা সতীশ'। লেঠেল দিয়ে জমি দখল করা ও ধানকাটা এসব একসময় সহজ কাজ ছিল সতীশের কাছে। তবে সে খুব ভালো বুঝত ব্যবসা। আর পরের জমি সম্পত্তির দিকে নজর থেকেছে বেশি। কাদের বাড়িতে গোলমাল, কাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়— এসব দেখে সতীশ এক সময় সুযোগ নিয়েছে ঢুকে পড়ার। তাতে তার লাভই হয়েছে। ওইভাবে জমিজায়গা বাড়িয়েছে। ধর্মকর্মে কখনও মন দেয়নি। পুরনো যুক্তি মেনেছে, 'জমি বাপের এবং দাপের।' সম্পত্তি বাড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছেলেরা তৈরি না হওয়ায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। কাশীনাথ সব গুছিয়ে নিতে চেয়েছিল এমনভাবে যা সতীশের পছন্দ হয়নি। সতীশ ছোটোছেলের উপর একটু চটতেই ঢুকে পড়ল বটকৃষ্ণ। বাবার প্রিয়পাত্র হয়ে গুছোবার দিকে মন দিলো। কাশীনাথ নিজের ভাগের জায়গা জমি বেরাদের বিক্রি করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। সতীশ খুব চেনা লোকদের বলত, 'ছেলেগুলো মানুষ হলো না। ওদের জন্যে অনেক কিছু করে দিতে চেয়েছিলাম। ওরা কুঁড়ে, ওরা ঝগড়াটে, ফাঁকি মেরে সব পেতে চায়।'

হোতুর গ্রামের বাড়ির পাশেই ওদের বাড়ি। সতীশ অনেক কথা বলত হোতুকে। নিজের বাড়ির কথার সঙ্গে গ্রামের পুরনো দিনের অনেক ছবি তুলে ধরত। হোতু শুনত মন দিয়ে। সতীশ মান্নাকে বলেছিল, 'বাড়ির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান। আর বিষয় সম্পত্তি বাড়াবার দিকে নজর দেবেন না। পরের জায়গা জমির উপর লোভ ঠিক নয়। তাতে মর্যাদা বাড়ে না। আখেরে ক্ষতিই হয়।' সতীশ মান্নার নাতিরা এখন তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে। গ্রামের স্কুল তৈরির সময় সতীশ মান্নার কাছে কিছু ইঁট আর টালি চাওয়া হয়েছিল। পাওয়া যায়নি। বটকৃষ্ণ বলেছিল, 'ওসব দেওয়ার অনেক লোক আছে। আমরা দেবো না।' সতীশের অন্য দুই ভাই যতীন আর ক্ষুদিরাম দিয়েছিল ইঁট টালি। সতীশ শেষ বয়সে আপশোস করত, 'স্কুলের জন্যে কিছু না দেওয়া মস্ত ভুল হয়েছে।' গ্রামে যখন স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কথা ভাবা হয় সতীশ দিয়েছিল ইঁট টালি টাকা নিজে এগিয়ে গিয়ে। বটকৃষ্ণ আপত্তি করতে চেয়েছিল। সতীশ বলেছিল, 'আমার জিনিস কাকে দেবো না দেবো তা দেখবো আমি। তুমি নয়।' বটকৃষ্ণ আর কথা বলেনি। কারণ সে বুঝেছিল বাবা রেগে গেলে মুশকিল হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধনের দিন সতীশ হাজির হয়েছিল ফর্সা ধুতি শার্ট পরে নাতি রঘুনাথের সঙ্গে। হোতুকে বলেছিল সতীশ, 'এই ভালো কাজটা আগে হলে গ্রামের অনেক লোকের উপকার হোত।' হোতু হাসল।

কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

বই কেনার শখ, বই পড়ার নেশা এক নয়

বই পেলেই উল্টেপাল্টে দেখার অভ্যেস রয়েছে দেবাদৃতার। প্রত্যেকটি বই সে যত্নে রাখে। পড়ে নেয়। নিজের সংগ্রহের বইগুলো তার খুব পছন্দের। বইগুলো তাঁকে সঙ্গ দেয়। পাতাগুলো ওল্টায় মন দিয়ে সবসময়। ছবিও তার পছন্দের। দেবাদৃতার বাবার এক বন্ধু আছে পবনজেঠু। বই দেখলেই পাওয়ার জন্য ছটফট করে। বইটা তক্ষুনি চাই। কিছু লোকের দৃষ্টিখিদে থাকে। খাবার সামনে দেখলেই খেতে চায়। অভ্যেসটা খুব ভালো নয়। তাতে শরীর ভালো থাকে না। বদহজম হয়ে যায়। পবনজেঠুর দুরকম অভ্যেস আছে। বই দেখলে চাওয়া। কেউ কেউ দিয়ে দেখেছে, একবার বই দিলে ফেরত পাওয়া কঠিন। অনেক সময় পবনজেঠু বই কেনে। সব থেকে বেশি ছাড়ে বই কেনার দিকে ঝোঁক। কিন্তু যারা বই বিক্রি করে তারা রাজি হয় না। বলে, 'আমরা যে ছাড় পাই তা আপনাকে দিলে আমাদের ব্যবসা করার মানে হয় না।' পবনজেঠু এই যুক্তিটা বুঝতে চায় না বলে অনেকেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজি নয়। পবনজেঠুর বন্ধু বাসুদেব গুপ্ত বলে, 'ওর বই কেনা বা সংগ্রহ করাটাও বাতিক। কোনও বই-ই মন দিয়ে পড়ে না। মনেও রাখতে পারে না। আসলে পবনের সব কাজের মধ্যে দেখানোপনা রয়েছে।' ওদের বন্ধু সুবীর মিত্র প্রচুর বই কেনে আর পড়ে। পবনের টাকা আছে, কেনে। কিন্তু সাজিয়ে রাখে না। পড়ে না, শুধু জ্যাকেট পড়ে ভাব দেখায় কত পড়ে। সুবীরজেঠু অনেক বই উপহার দিয়েছে দেবাদৃতাকে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. 'এঁদো গলি থেকে বেণিমাধব' লিখেছেন কোন্ চিত্রকর? তাঁর দুই বিখ্যাত ভাইয়ের নাম?

২. 'গোঁসাইবাগানের ভূত', 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' লিখেছেন কে?

৩. 'ব্যোমকেশ বক্সী' চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন কে? তাঁর জন্ম মৃত্যু?

৪. লেখক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কার পুত্র এবং কোন্ বিখ্যাত চিত্রকরের দৌহিত্র?

৫. চিত্রকর গণেশ পাইন জীবনের বেশিরভাগ সময় যেখানে থেকেছেন সেই রাস্তার নাম? ছোটোদের জন্যে তাঁর কাজ কি?

উত্তর ১. শানু লাহিড়ী। কমলকুমার মজুমদার, নীরদ মজুমদার। ২. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ মার্চ ১৮৯৯— ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০। ৪. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫. কবিরাজ রো। অ্যানিমেশান ফিল্ম-এর জন্যে ছবি এঁকেছেন। এঁকেছেন ছোটোদের জন্যে কিছু ছবি।

দুই সাথী প্রিয়, চিরস্মরণীয়

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

কিশোর শহিদ ক্ষুদিরাম বসু

দেশের দুঃখ করতে হরণ
মায়ের চরণ নিয়েই শরণ
করল কে ভাই মরণ বরণ
 জানো কি তার নাম?
হাজার প্রণাম, লক্ষ সেলাম
 শহিদ ক্ষুদিরাম।

দেশ মা-কে কে ভালোবেসে
বীরের মতই এগিয়ে এসে
ফাঁসির দড়ি পরল হেসে
 শুধলো স্নেহের দাম?
হাজার প্রণাম, লক্ষ সেলাম
 শহিদ ক্ষুদিরাম।

দামাল কিশোর প্রফুল্ল চাকী

নাম ছিল তার 'প্রফুল্ল' আর
পদবি তার 'চাকী',
মৃত্যুভয়েও দেশ মা-কে সে
দেয়নি কভু ফাঁকি।

'কিংসফোর্ড'কে মারতে গিয়েই
জীবন দিলেন তিনি,
স্বাধীনতার প্রথম শহিদ
বলেই তাঁকে চিনি।

কিশোর শহিদ ক্ষুদিরামের
যোগ্য সাথী প্রিয়,
দুঃখে-সুখে থাকবে বুকে
তোমরা বরণীয়।

ভারতের প্রথম ফায়ার উইমেন

ইন্দিরা রায়

সম্প্রতি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা শিয়ালদার সূর্যসেন মার্কেটে। ওই অগ্নিদগ্ধ জতুগৃহে ঘুমন্ত অবস্থায় নির্দোষ কিছু মানুষের দুর্বিষহ মৃত্যু বড়ই মর্মান্তিক। তার কিছুদিন আগে বড়বাজারের নন্দরাম মার্কেটের আগুন, সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতালের আগুন ক্ষতিগ্রস্ত করল বেশকিছু প্রাণ ও সম্পত্তি। এছাড়া আমরির বীভৎস লেলিহান শিখায় কেড়ে নেওয়া প্রাণগুলির মর্মন্তুদ বেদনাদায়ক ঘটনায় আজও শিউরে উঠতে হয়। মিডিয়ার মাধ্যমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এমন একজন ভদ্রলোকের কথা জানা গেল, যিনি দমকলকর্মী নন, স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়েন অগ্নিদগ্ধ পরিবেশে। আগুন লাগার ঘটনা কানে গেলে পোশাক বদলে উনি ছুটে চলেন আগুনের বদ্ধ পরিবেশ থেকে আজও বন্দী মানুষদের উদ্ধার করতে। এই খবরটি দূরদর্শনের পর্দায় দেখা ও জানার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল এমনই এক দুঃসাহসিনী আগুন কন্যার নাম--- হর্ষিণী। হর্ষিণী কানহেকার (Kanheker) নাগপুরের মেয়ে।

'আগুন আমার ভাই' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা রয়েছে এই দুর্দমনীয় মহিলাটির। এই দুঃসাহসিক কাজ শুধুমাত্র আর্তের সেবার জন্য নয়, রীতিমত ফায়ার ইঞ্জিনিয়রের পেশায় নিযুক্ত একজন অভিজ্ঞ দমকলকর্মী হিসেবে। আগুন নেভানোর কাজে মহিলার ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত সততই বিরল। এবার জানা যাক, তাঁর এ পথে আসার কথা। ভয়-ত্রাস-আশঙ্কা এসব ব্যাপারগুলি নিয়ে কোনওদিনই মাথাব্যথা নেই হর্ষিণীর। তবে অন্যদের ভয়-আশঙ্কা এমনকি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর এই মহিলাটি। ভারতের প্রথম ফায়ার উইমেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আর্তদের বাঁচাতে আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে কুণ্ঠিত হন না। বাড়িয়েছেন ভরসার হাত।

হর্ষিণী কানহেকার

প্রত্যেকটি মেয়েই চায় স্বাবলম্বী হতে এবং তার তাগিদে কোনও মর্যাদাসম্পন্ন পেশায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। সাধারণত মেয়েরা স্কুল-কলেজ, সরকারি/বেসরকারি অফিস, রিশেপসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজেকে নিযুক্ত করতে চায়। এখনকার দিনে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পুলিশের কাজেও মেয়েরা এগিয়ে আসছে। কিন্তু এসব পেশার বাইরে সম্পূর্ণ নিজের জীবন বিপন্ন করে আগুনের হাত থেকে অন্যের প্রাণ বাঁচাতে এ পেশায় এলেন কেন— তারই প্রেক্ষিতে জানা গেল— জীবনে দাঁড়াবার জন্য কলেজজীবন শেষ করার পর বিভিন্ন পরীক্ষা অর্থাৎ ইউপিএসসি-র মতো পরীক্ষায় বসতে শুরু করেন হর্ষিণী। এমবিএ-তে ভর্তি হয়ে পড়বেন বলেও ঠিক হয়েছিল। ঠিক এই সময়ে কাগজে একটি বিজ্ঞাপনে তাঁর চোখ আটকে যায়। নাগপুরে ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপন ছিল সেটি। দেখা মাত্রই উৎসাহিত হয়ে মেয়েটি আবেদন করেন। বাবা-মার স্বভাবতই তেমন সম্মতি ছিল না; কিন্তু মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁরা যাননি। এন এফ সি-তে পড়ার জন্য অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় বসতে হয়, শুধু লিখিত নয়, শারীরিকও। হর্ষিণী অনায়াসে লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেও সমস্যা হলো শারীরিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে। ছেলেদের জন্য কিছু মাপকাঠি ছিল, কিন্তু মহিলাদের ব্যাপারটায় সমস্যা দেখা দিল। এক্ষেত্রে পরীক্ষকরাও হতচকিত হয়ে পড়লেন। কোনও মেয়ে তো এতদিন এই পথে আসেনি, তাই কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। যা হোক, শুধু উচ্চতা, ওজন আর বর্ণান্ধ কিনা পরীক্ষা করেই তাঁকে উত্তীর্ণ করেছিলেন। কলেজে সুযোগ যদিও বা পাওয়া গেল তো থাকা নিয়ে সমস্যা, কারণ কোনও মহিলা আবাসিক ছিল না। যেহেতু নাগপুরেরই বাসিন্দা তাই যাতায়াত করে পড়ার সুযোগ মিলেছিল। কিন্তু ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া তো অত সহজ ব্যাপার নয়। অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে হয় এক্ষেত্রে। কী ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সে বিষয়ে জানা যাক। তার নিজের কথায়— ''ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পড়াটা আর পাঁচটা বিষয় নিয়ে পড়ার মতো নয়। একই সঙ্গে অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি, প্যারামেডিক্যাল, টাউনপ্ল্যানিং, হেভি ভেহিকেল, রেসকিউ টেকনিক, ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে সব কিছু শিখতে ও পড়তে হয়। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক প্রশিক্ষণও জরুরি। মেয়ে বলে কোনও খাতির নেই। একবার একটা প্রশিক্ষণের সময় কৃত্রিমভাবে সাজানো হয়েছিল উঁচু একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে। ভেতরে অনেকে আটকে আছে। তাঁদের উদ্ধার করার দায়িত্ব পড়ল। কিছুটা তো ঘাবড়ে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, যখন এপথে এসেছি, পারতে আমাকে হবেই। মই লাগিয়ে ওপরে উঠে মানুষ নামানোর মতো ভারি পুতুল নামিয়ে আনতে সক্ষম হলাম।'' এতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠেছেন হর্ষিণী।

তিনি এতটাই দৃঢ় ও তেজস্বী ছিলেন যে কখনও কোনও সুবিধে বা সাহায্য চাননি কারও কাছে। কঠিন কর্মের শিক্ষানবিশে একা মহিলা শিক্ষার্থী হিসেবে কখনও কোনও হতাশার কথা, নিরুৎসাহিত হওয়ার কথা শুনতে হয়নি। উপরন্তু শিক্ষকরা, অভিভাবকরা সামনের দিকে সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন। তাই তো হর্ষিণী আজও সফল দমকলকর্মী হিসেবে দক্ষ। পড়াশোনার শেষে ইন্টার্নশিপের সময়ে কলকাতায় দমকল বিভাগে ছিলেন, সে সময় থেকে কলকাতার সঙ্গে তাঁর সখ্য। এখন মেয়েরা সদর্পে ইঞ্জিনিয়ারিং- এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়তে যাচ্ছে, কিন্তু ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়তে আসার মহিলা কোথায়! হর্ষিণীই হবেন এ পথের পথিকৃৎ। তিনিও চান মহিলারাও এগিয়ে আসুক এ লাইনে।

পরিবারতন্ত্র বজায় রাখতে নতুন ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন উদগ্রীব রাজকুমার

অতিথি কলম

স্বামীনাথন আইয়ার

রাহুলজী, গত সপ্তাহে হঠাৎ আপনি কি জানি কি ভেবে বলে বসলেন বিয়ে আপনি করবেন না। কেননা সেক্ষেত্রে আপনার ছেলেপুলেদের রাজা করবার দায় আপনার ওপর আসবে। তাই এটা আপনার মায়ের পথ অনুসরণ করারই সামিল হবে। যার অর্থ যেমন চলছে তেমনই চালিয়ে যাওয়া অর্থাৎ আজকের কংগ্রেসী সংস্কৃতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখা।

আপনার দ্বিতীয় চমক, আপনি প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে নেই। হায়রে! প্রধানমন্ত্রীই যখন হবেন না তাহলে আর ছেলেপুলেদের সিংহাসনে বসাবেন কি করে?

যাইহোক, এটা ভাবলে অবশ্যই আশার সঞ্চার হয় যে আপনি কংগ্রেসর চলতি স্থিতাবস্থা ভাঙতে চান। তবে আমার কেমন যেন মনে হয়— আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। আপনার মা এবং স্বয়ং আপনি এই এতগুলো বছর দিব্যি ক্ষমতার অলিন্দে বসে থেকেও এই নিরুপদ্রব চালিয়ে যাওয়ার স্থিতাবস্থাটিকে ভাঙ্গবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি কেন? আপনি আপনার দলীয় নেতা-মন্ত্রী, সদস্য, সমর্থক সফলের মধ্যে একটা ধারণাই কেবল যত্নে ও কৌশলে কেন চারিয়ে দিয়েছেন যে আপনাদের পারিবারিক শাসন ছাড়া কংগ্রেস দলের আর কোনও নিজস্ব নীতি, যৌক্তিকতা তথা ভবিষ্যত নেই? আপনারা ছাড়া তারা অস্তিত্বহীন। আদতে কিন্তু কোনও কংগ্রেসীই মনে করে না যে আপনার বিয়ে করা বা না করায় দলের সামন্ততান্ত্রিক ও পরিবারতান্ত্রিক কোনও কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে। দেখুন, জয়ললিতা বা মায়াবতী কেউই বিবাহিত নয় আর তাদের সন্তানাদিও নেই। তাতে কি তাদের তুমুল একনায়কতান্ত্রিক শাসন চালাতে কোনও অসুবিধে হয়েছে। উত্তরাধিকারী না থাকলেই ক্ষমতার কিছু ভাগ বাঁটোয়ারা হতে পারে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই।

তবে হ্যাঁ, সামন্ততান্ত্রিক দলগুলিতে পরিবারের সমালোচনা করা রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল। যেমন ধরুন ২০০৯ এর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসী সাফল্যের ভাগীদার হলেন কেবল মাত্র মা আউর বেটা। অথচ ২০১০-এর বিহার আর ২০১২-র উত্তর প্রদেশে নির্বাচনে কংগ্রেসের ধুয়ে মুছে যাওয়ার দায় পড়ল পাঁচু গোমস্তা— দলীয় মোসায়েবদের ওপর। আপনার গায়ে আঁচ লাগলেই সর্বনাশ। সত্যি সত্যি আপনি স্থিতাবস্থা ভাঙতে চাইলে কিন্তু ভাই, আপনাকে বলতে হবে আমি বিহার ইউ পি-তে ব্যাপকভাবে বেড়িয়েছি। হেলিকপ্টার উড়াউড়ি, মাটি কামড়ে বা আঁকড়ে পড়ে থাকা সব গোল্লায় গেছে। মানুষ আমাকে নেয়নি। আমার বদলে তোমরা অন্য কাউকে নিয়ে এস। আপনি তা যদি না বলেন (বলবেন না নিশ্চয়), আর আপনি ও আপনার দলের লোকেরা মনে করে যে আপনার থেকে ভাল আর কেউ হয় না তাহলে বড়দা 'স্থিতাবস্থাই' চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এদিকে বহুদিন ধরে তরুণদের তুলে আনার বাণী ছাড়ার পর আপনি সত্যিই অনেক আনকোরাকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠান করিয়েছেন। তারা ভারতীয় মাপকাঠিতে তরুণও বটে যদিও অনেকেরই মাথা সাদা চুলে গিজগিজে। দিল্লীর নক্ষত্রখচিত তালিকাটিতে রয়েছেন— জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, মিলিন্দ দেওরা, শচীন পাইলট, নীতিন প্রসাদ প্রমুখ। এটিই কি আপনার স্থিতাবস্থা ভাঙ্গার প্রাথমিক নিদর্শন। এই তথাকথিত কচি-কাঁচারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রভাবশালী জীবিত অথবা মৃত কংগ্রেস নেতাদের পুত্র। অবশ্যই তাঁরা চালাক-চতুর, শিক্ষিত এবং হয়তো যোগ্য। তবে তাঁরা একবাক্যে পরিবারতন্ত্রের অমোঘ ধ্বজাধারী।

এবার একটু রাজ্যগুলোর দিকে নজর দেব। উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বহুগুণা তৎকালীন অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত হেমবতীনন্দন বহুগুণার ছেলে। উত্তরপ্রদেশে আপনার দল হেরে গেল, কিন্তু যদি স্বপ্নেও শিকে ছিঁড়ত তাহলে লাইনের সামনের দিকেই ছিলেন রীতা বহুগুণা যোশী। উনি তো আবার হেমবতীনন্দনেরই মেয়ে।

> “যতদিন গান্ধী পরিবার রাজনীতির সর্বোচ্চ পদগুলি কুক্ষিগত করে রাখবে ততদিনই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র একটি ছলনামাত্র।”

পরিবারতন্ত্র জারী রাখার ব্যাপারটা কি সত্যিই বদলাচ্ছে? আবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীটি তো প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী এস বি চৌহানের ছেলে।

নজর করলে দেখা যায় আপনি দলের মধ্যে লাগাতার অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র লাগু করার কথা বলে আসছেন। মনে পড়ে, আপনি একবার আপনার অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে বলেছিলেন, যে বিধায়কের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে সেই সাংসদ হবার আশা করছে, যে সাংসদের সঙ্গে দেখা হয়ে হয়েছে সেই কোনও দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার আশা রাখে। কিন্তু যে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে— তাদের কেউই বিধায়ক হবার আশা পোষণ করেনি। আপনি এতে অসন্তোষ ব্যক্ত করে এদেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আপনি কি জানেন অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র এখানেই শেষ হয়ে যায় না, তার কক্ষ পথ আরও ব্যাপক। তাই হয়তো আপনি বলতে পারলেন না যে আপনি আন্তরিকভাবে চান প্রত্যেক কেন্দ্রীয়মন্ত্রীই আশা করুক সে একদিন প্রধানমন্ত্রী হবে নয়ত বা কংগ্রেস সভাপতি হবে। এমনটাই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের রীতি-নীতি ও অগ্নিপরীক্ষা।

এই প্রসঙ্গে যতদিন গান্ধী পরিবার রাজনীতির সর্বোচ্চ পদগুলি কুক্ষিগত করে রাখবে ততদিনই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র একটি ছলনামাত্র। আপনাকে ও আপনার মায়ের কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় ঠিক বিলেতের রাণী এলিজাবেথ ও প্রিন্স চার্লসের মতোই আপনারা ভারতের রাজনীতিতে গেড়ে বসে গেছেন।

আপনি বলছেন আপনি প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে নেই। বাবা আমার! সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোনও দৌড়-ফৌড় নেই। এখানে প্রকৃতির নিয়মে পারিবারিক প্রার্থীই জয়ী হয়। হ্যাঁ, অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই ঘরোয়া লড়াই দেখা যায়। যেমনটা তামিলনাড়ুতে স্টালিন আর আলাগিরির (করুণানিধির দুই ছেলে) মধ্যে চলছে বা মহারাষ্ট্রে রাজ ও উদ্ধব ঠাকরের মধ্যে। কিন্তু আজকের তারিখ অবধি আপনাকে নিয়ে পরিবারের মধ্যেও কোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতা নেই। অন্যদিকে জয়ীকে যে সব সময়ই প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই শাসন করতে হবে এমন কোনও মাথার দিব্যি নেই। আপনার মা প্রমাণ করে দিয়েছেন সরকারের বাইরে থেকেও সব ক্ষমতা ভোগ করে নিরুপদ্রব শাসন চালানো যায়। দল এখানে কোনও দৌড়ও হতে দেয়নি। দলনেত্রীই তো বিধাতা।

যাইহোক, এই বিচার বিশ্লেষণটিতে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবার কোনও কারণ নেই। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এমনটা অনেক সময়ই দেখা গেছে প্রথমবার প্রভুরা ক্ষমতার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখালেও হয়তো ঠিক সময়ে ডালটি ধরে ফেলেছেন। লোকে আবার অনেক সময়ই এতে ধন্য ধন্য করে। আসলে ধোঁকা খেয়ে যায়।

রামায়ণেই দেখুন না, রামের পক্ষ অবলম্বন করার সময় বিভীষণ বলেছিলেন আমি নীতির জন্য দাদাকে ছেড়ে যাচ্ছি, ক্ষমতার প্রলোভনে নয়। পরে দেখা গেল ভাইকে সরিয়ে তিনি রাজাও হয়েছেন, জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন। এর থেকে কি বোঝা যায়?

(বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

আপনার স্বপ্নগুলো যা-ই হোক ধাপে ধাপে তাকে বাস্তবায়িত করুন

MUTUAL FUND-এ SIP শুরু করুন।

প্রতি মাসে মাত্র 500 টাকা করেও শুরু করা যায়।

DRS INVESTMENT

Debashis & Subhasis Dirghangi
Mutual Fund/Insurance/ Fixed Deposit/ Pan Service/Mediclaim

facebook|http://facebook.com/debashislicmdrt

Mobile No. 9830372090/9433359382/81

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR BANKURA - 722155

CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

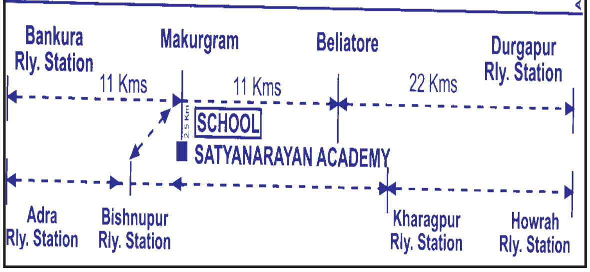

বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে মাছের চারা আসছে

অজয় সরকার : বালুরঘাট ॥ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন অবৈধভাবে মাছের চারা ভারতে আসছে এবং সেই চারাগুলিই ভারতের বিভিন্ন জলাশয়ে, পুকুরে চাষ করা হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্য মৎস্য দপ্তর থেকে এ বিষয়ে জেলা মৎস্য দপ্তরকে চিঠির মাধ্যমে জানানোও হয়েছে। জেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কাস্টমস, পুলিশ ও বিএসএফ-কে জানানো হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা যায়। কিন্তু তারপরও অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই সাধারণ মাছের সঙ্গে বার্মিজ এবং তাই কই মাছও ব্যাপক হারে জেলা তথা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে এই মাছগুলির ক্ষতিকারক দিক থাকার সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিনিয়ত ছোট ও বড় মাছের চারা এপারে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন পুকুর ও জলাশয়ে যে মাছগুলি চাষ করা হচ্ছে তার বেশীরভাগই বাংলাদেশ থেকে আসা মাছের চারা। এক শ্রেণীর অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ী বাংলাদেশ থেকে এই মাছের চারাগুলি এপারে নিয়ে আসছে এবং এদেশের মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মৎস্য ব্যবসায়ী বলেন, আমাদের এখানে যে পরিমাণ মাছের চারার চাহিদা সেই পরিমাণ মাছের চারার যোগান না থাকার কারণেই বাংলাদেশি মাছের চারাগুলিকেই কিনতে বাধ্য হচ্ছি। তার ওপর নৈহাটি থেকে মাছের চারা নিয়ে এসে মাছ চাষ করলে খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে মাছের যে চারাগুলি আসে সেগুলির বৃদ্ধি এখানকার মাছের চারা থেকে অনেক দ্রুত হয়।

অন্যদিকে জেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বালুরঘাট ব্লকের সমস্ত জলাশয়গুলির চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী মার্চের মধ্যেই এই চিহ্নিত করার কাজ শেষ হবে বলে জানা যায়। জলাশয়গুলির কোন্‌টিতে মাছ চাষ হয়, কে চাষ করেন তার সমস্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে জানা যায়।

জেলা সহকারী মৎস্য অধিকর্তা সলিল বিশ্বাস বলেন, বাংলাদেশ থেকে কিছু মাছের চারা এদেশে ঢুকছে। পাবদা, সরপুঁটি, কই, মাগুর, শিঙি সহ বহু মাছের চারা এদেশে আসছে। এব্যাপারে রাজ্য মৎস্য দপ্তর থেকে চিঠি পাওয়ার পর জেলার বিএসএফ, কাস্টমস ও পুলিশকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু বহুদিন পার হলেও তার কোনও সুরাহা হয়নি। কোনরকম পরীক্ষা ছাড়া এই মাছগুলি বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে এর কোনও কুপ্রভাব পড়বে কিনা তার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। অবিলম্বে ভারতে চোরা পথে এই মাছের চারা আসা বন্ধ হওয়া উচিত।

সংবাদদাতা ॥ ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা শাখার হাজারখানেক কর্মী অখাউরা (Akhaurah) চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্যাতনের প্রতিবাদে ও যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবীতে 'বাংলাদেশ চলো' অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই অভিযানের মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গঙ্গা দূষণ রোধে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গঙ্গানদী ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু। সেই গঙ্গাস্রোতধারায় বড় বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপের ফলে সেই জলধারা অবরুদ্ধ হতে চলেছে। গঙ্গার দূষণ রোধ ও অবিরল জলধারা অব্যাহত রাখার জন্য জনজাগরণে বেরিয়েছিলেন উমা ভারতী। গত বছর যুবা সন্ন্যাসী নিগমানন্দ গঙ্গানদী বাঁচানোর জন্য অনশন করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এখন স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ একই উদ্দেশ্যে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ২৬ জানুয়ারি থেকে তাঁর অনশন চলছে। কানপুর আই আই টি-র অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. জি ডি আগরওয়ালই স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ। তিনি অমরকণ্টকে নর্মদা তীরে অনশনরত আছেন। খুবই আনন্দের বিষয়, গত শুক্রবার ২২ মার্চ বিজেপির সাংসদ সুষমা স্বরাজ, শাহনওয়াজ হুসেন, সিপিআই-এর প্রবোধ পাণ্ডা, সমাজবাদী পার্টির বেরতীরমন সিংহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন তিনি বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন।

তিরুপতি মন্দিরের ২৭ লক্ষ টাকা দামের ঘড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী দেবতা বলা হয় অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা দেবস্থানের ভগবান বেঙ্কটেশ্বরকে। ভক্তরা মন্দিরে দেবতা দর্শন করে যা প্রণামী দেন তার পরিমাণ বিপুল। মন্দিরের সব কাজ ঠিকভাবে দেখাশোনার জন্যে কুশলী ব্যক্তিরা রয়েছেন বিভিন্ন ব্যস্ত বিভাগে। দেবতা সর্বজনের। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রণামীর হিসেব ঠিকমতো না রাখা হলে গুরুতর অধর্ম হবে। মন্দিরের অর্থভাণ্ডার দিনে দিনে বাড়ছে। তা আরও বাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগে সেই

টাকা বিনিয়োগ করে। সব উদ্যোগই লাভজনক। কদিন আগে খবর এলো মন্দিরের পক্ষ থেকে বিশেষ ঘড়ি তৈরি হয়েছে। যার এক একটির দাম ২৭ লক্ষ টাকা। যন্ত্রে নয় হাতে তৈরি নকশা। ৩৩৩টি ঘড়ি তৈরি করতে দেওয়া হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের এক বিখ্যাত ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাকে। ১৮ ক্যারেট সোনার ঘড়ি। খোদাই করা থাকছে তাতে মন্দিরের প্রতিচিত্র আর বেঙ্কটেশ্বরের মূর্তি। শুধু সোনা নয় আরও অনেক মণিমুক্তো যোগ হওয়ায় দাম এত বেশি। টাকার পরিমাণ যথেষ্ট হলেও কেনার লোকজন কম নয়। ধনী ভক্তরা বলছেন, 'ওই ঘড়ি হাতে থাকলে ভাগ্য প্রসন্ন হবে। অনেক বাধা পেরোনো যাবে।' একদল ভক্ত অখুশি। তাঁরা বলছেন, 'মন্দির কর্তৃপক্ষের উচিত হয়নি ঘড়ির ব্যবসা করা। মন্দির ও দেবতা মূর্তি খোদাই করা ঘড়ি লোকে বাঁ হাতে পরবে— এটা কি ঠিক?' মন্দির কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ঘড়ি বিক্রি করে যে টাকা আসবে তা দিয়ে বিভিন্ন জনকল্যাণকর কাজ হবে। কোনওরকম লাভ না রেখে এরকম এক উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে সেবামূলক কাজে ব্যয় করার কাজকে সমর্থন জানাবার লোকজন বাড়ছে।

নেত্রীর সুশাসনে বিউটি স্পট দেগঙ্গা, কুলপী, গার্ডেনরিচ, ক্যানিং

চৈতন্য বর্ধন

ইংরেজীতে কথা আছে— কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা খবর নয়; কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটি ব্যানারে হেড-লাইনে ছাপাবার মতো খবর হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকেও মনে হয় কুকুর

দেড় বছর পূর্বে দেগঙ্গায় তাঁর দলের মুসলমান গুণ্ডার দল হিন্দুদের উপর দুদিন ধরে যে দাঙ্গা চালিয়ে গেল, সে বিষয়ে তিনি অদ্যাবধি মুখ খোলার সময় পাননি। কিন্তু যখনই কোনও মুসলমান কোথাও আছাড় খেয়ে পড়ে, কিংবা কোনও মুসলমান গুণ্ডা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তখনই মুখ্যমন্ত্রীর

হিন্দুদের কাছে ভাগাড়ের চেহারা পাচ্ছে, তা কি ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে? সিপিএম শাসনের কলঙ্কের যদি হয় ধানতলা আর বানতলা, তৃণমূল নেত্রীর সুশাসনের বিউটি স্পট (বা ব্ল্যাক স্পট) হলো দেগঙ্গা, কুলপী, গার্ডেনরীচ আর ক্যানিং। সত্যি কথা বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা

ক্যানিং-এ দাঙ্গায় বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি। (ফাইলচিত্র)

কামড়ানো দশায় পেয়েছে— তাঁর সাম্প্রতিক কথাবার্তা ও চালচলনে মানসিক ভারসাম্য-হীনতার লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে। কোনও মুসলমানের একগাছা চুল খসে পড়লে তাঁর সমস্ত চুল খাড়া হয়ে ওঠে, কিন্তু কোনও হিন্দু মুসলমানদের হাতে ধনেপ্রাণে মারা গেলে, তিনি তাকে সাজানো ঘটনা বা তৃণমূল-বিরোধী চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন।

অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। শুধু তাই নয়, তিনি নাওয়াখাওয়া ভুলে গুণ্ডাদের চরিত্র সাফাইয়ের কাজে লেগে যান। তাদের তাঁর দলের সম্পদ বলে ঢালাও সার্টিফিকেট দেন।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে পশ্চিমবঙ্গ উর্ধ্বাকাশে উঠছে, কি রসাতলে যাচ্ছে, আমরা সে প্রশ্নে যাচ্ছি না; কিন্তু তাঁর সুশাসনে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি যে

মুসলিম লীগ শাসনে হিন্দুদের অবস্থাকেও হার মানিয়েছে। রোম যখন জ্বলছিল, তখন সম্রাট নীরো নাকি বেহালা বাজাচ্ছিলেন, আর পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর জীবনযন্ত্রণা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী আনন্দে মেলা মহোৎসব করে ঘুরছেন, বেড়াচ্ছেন, ফিতা কাটছেন, পাথর বসাচ্ছেন, ধানচারা পুঁতছেন। মেসিন

ঘোরাচ্ছেন, তুলি বোলাচ্ছেন, ছবি বেচছেন, ইমাম মোয়াজ্জিনদেন ভাতা দিচ্ছেন, মাদ্রাসার মঞ্জুরি দিচ্ছেন, কবরখানার সংস্কার করছেন, মুসলমান ছাত্রীদের সাইকেল দিচ্ছেন, মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি দিচ্ছেন, পাইকারি হারে মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিচ্ছেন, মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বাচ্চাদের গাল টিপছেন— কিন্তু ভুলেও জিজ্ঞাসা করছেন না কয়গণ্ডা বাচ্চা। আইন- শৃঙ্খলাকে তিনি সামাজিক শৃঙ্খল বলে মনে করেন— তাই যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অকারণে আইন শৃঙ্খলা ভাঙছে তাদের তিনি পুরস্কৃত করেন। আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে নিহত বা নিগৃহীত পুলিশ কর্মচারীদের তিরস্কার করছেন কেন তাঁরা অযথা বাড়াবাড়ি করছেন। নিরীহ অপরাধীদের ভাই বাছা বলে জামাই আদরে আটকে রেখে গোস্ত-রুটি খাওয়াননি কেন?

মুখ্যমন্ত্রীর বল্গাহীন আলগা শাসনে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা ১৯৪৬-এর নির্বাচনে জিতে রাইটার্স বিল্ডিং দখল করে সুরাবর্দী যে আসুরিক শাসন চালিয়েছিল হিন্দুদের ওপর, তার সঙ্গেই তুলনীয়। লীগ আমলের এলাকা সর্দারদের মতোই তিনি কলকাতা শহর ও মুসলিম অধ্যুষিত জেলার সর্দারদের রাইটার্সে ঢুকিয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেরই জেল হাজতে থাকার কথা, অথচ প্রশাসনকর্ত্রীর পাশে দাঁত বের করে তাদের হাসতে দেখা যাচ্ছে। যেহেতু তারা সর্দার হিসাবে শাসকপার্টির জন্য মহল্লার ভোট ম্যানেজ করে। ফলে এদের অপরাধজগত দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠে হিন্দুদের মানইজ্জত ধনসম্পদ নিয়ে বসবাস দুর্বিষহ করে তুলেছে।

এই সরকার পোষিত ও অনুমোদিত দুরাত্মাদের কবলে হিন্দুরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। হিন্দুদের স্ত্রী-কন্যাদের নির্বিঘ্নে পথেঘাটে চলাচলের নিরাপত্তা নেই। শ্লীলতাহানি, কলেজে যাতায়াতের পথে অশ্লীল আচরণ, কদর্য ভাষায় টিটকারি তো নিত্যকার ঘটনা। হিন্দুপাড়ায় বাড়ি বাড়ি দলবদ্ধ ডাকাতি। ডাকাত দলের ৯৯ শতাংশ মুসলমান। অথচ শহর ও গ্রামাঞ্চলে লক্ষ কোটি টাকার মালিক মুসলমান বাড়িতে কোনও চুরি- ডাকাতির ঘটনা ঘটে না।

হিন্দুদের মন্দির ভাঙা ও মন্দিরের লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি অপহরণ চলছে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী। সিপিএম আমলে কোচবিহার রাজবাড়ির বহু শতাব্দী প্রাচীন মন্দির থেকে যার শুরু, তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলের হিন্দু দেবদেবীর মন্দির লুট ও মূর্তি ভাঙ্গা গুণ্ডাদলের অন্যতম পেশা হয়ে দাড়িয়েছে। কারণ শাসনক্ষমতা হস্তান্তর ও পরিবর্তনের ফলে বাম আমলের গুণ্ডার দলই লাল রঙ বদল করে সবুজ রঙ ধরেছে।

কিন্তু রঙ বদল করলেই তো আর স্বভাব বদল হয় না। তারা দাঁত-নখ ও শিং নিয়েই দল পরিবর্তন করেছে এবং মহানন্দে সেসব অস্ত্র প্রয়োগ করে যাচ্ছে অরক্ষিত হিন্দু সমাজের উপর।

পুলিশ অফিসার নজরুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে অদ্যাবধি কোনও মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হয়নি বলে। তাঁর এই ক্ষোভ অকারণ। তাঁরা মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী পাননি ঠিক, কিন্তু নামে না হোক, কামে যে মুসলমান মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন তা কি অস্বীকার করতে পারবেন?

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

নৌকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা

রোগীদের পরীক্ষা করছেন ডাক্তারবাবু।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভেসে যায় আদরের নৌকো। তোমাদের ঘুম ভাঙে কলকাতায়, থুড়ি বালাগাঁও চরে। ব্রহ্মপুত্র নদ ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। চারিদিকে শুধু থৈ থৈ করছে জল। প্রকৃতি যে খুবই মনোরম তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে রোগ-ব্যাধি হলে মনোরম প্রকৃতিকে রুদ্রমূর্তি রাক্ষসী ব্যতীত আর কিছু বলেই মনে হয় না গ্রামবাসীদের কাছে। কারণ সেখানে একটাও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। তবে তাঁদের এই চরম অভাব ঘুচিয়ে দিতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে ‘নৌকা স্বাস্থ্য সেবা’। রবীন্দ্রনাথের পদ্মাবোট যে শিলাইদহের প্রজাদের কাছে অনাবিল আনন্দ আর শান্তির বার্তা বহন করত, সেন্টার ফর নর্থ-ইস্ট স্টাডিজ অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ (সি-নেস) নামক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির ‘বোট ক্লিনিক’ যেন সেভাবেই স্বস্তি দিচ্ছে বালাগাঁও চরবাসীদের। শুধু বালাগাঁও কেন, ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে অসমে এরকম আরও অনেক চর জেগে রয়েছে। চারিদিক জলমগ্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্য-পরিষেবা বলে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং রোগ-ভোগে ভগবান ভরসাতেই দিন চলত। কিন্তু পরিস্থিতিটা আমূল বদলে যায় ২০০৫-এ ডিব্রুগড়ে সি-নেস-এর ‘আশা’ নামে নৌকা স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপনের পরেই।

‘বোট-ক্লিনিক’ বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না। মিনি-হাসপাতাল যেন, একটা নৌকায় চিকিৎসা-সংক্রান্ত এত সু-বন্দোবস্ত যে থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার— জলপথই যেখানে যোগাযোগের মূল মাধ্যম সেখানে জলপথেই চিকিৎসাকেন্দ্র, ব্যাপারটা আমাদের কাছেই যতই অভিনব মনে হোক, চরবাসীদের কাছে কিন্তু বিষয়টা একেবারেই স্বাভাবিক। এই বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির সমর্থনে এগিয়ে এসেছে ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন। এই মুহূর্তে সেন্টার ফর নর্থ-ইস্ট স্টাডিজ অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ অসমের ১৩টি জেলায় ১৫টি নৌকা স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র চালাচ্ছে। এবং দুর্গম দ্বীপগুলোর অন্তত দশ লক্ষ মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য-পরিষেবা যুগিয়ে চলেছেন তাঁরা।

নৌকায় ডাক্তাররা ছাড়াও থাকছেন নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, একজন ফার্মাসিস্ট ও আরও গোটা কতক সহায়ক। সেইসঙ্গে জেলার একজন প্রজেক্ট অফিসারও নৌকা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটিতে পরিদর্শক হিসেবে থাকছেন। যখন নদী জলে ভরা থাকে তখন নদীবক্ষেই চলে সেবাকাজ। আবার নভেম্বর থেকে মার্চ— এই শুষ্ক মরসুমে চরে নৌকা ভিড়িয়ে গ্রামে গিয়েই স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে সংস্থাটি। এইসব এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও দারিদ্র্যের হাল-হকিকত বুঝতে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। চর এলাকায় সরকারি খতিয়ানে ৫১,৭০৪ জন মানুষ পিছু থাকছে নামমাত্র একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এবং নদীর মধ্যবর্তীস্থলে ২০,০০০ মানুষ পিছু একটি উপকেন্দ্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এসবই রয়েছে সরকারি হিসেবে খাতায়- কলমে। বাস্তবে এর কোনও অস্তিত্বই হয়তো নেই। ২৪.৯ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন, যাঁদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ১৯.৩১ শতাংশ, যেখানে অসমে এই হার ৭৩.১৮ শতাংশ। সুতরাং চিকিৎসার অভাবে, শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার কিভাবে শিকড় ছড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। আর এতেই স্পষ্ট হয় নৌকা স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের উপযোগিতা।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
Super Cumin Powder
Super Turmeric Powder
Chilli Powder
Super Coriander Powder
Black Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

মুদ্রার প্রকারভেদ

কয়েকটি মুদ্রা ও তার উপকারিতা

সোহম মুদ্রা :

সুখাসনে বসে এই মুদ্রা করা উচিত। প্রথমে দুই হাতকে জঙ্ঘার উপর রাখা, তারপর চিত্র ১ এর মতো অঙ্গুষ্ঠাকে কনিষ্ঠা অঙ্গুলির জড়-এর সঙ্গে লাগানো। তারপর অঙ্গুষ্ঠাকে ভিতরে রেখে ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়ে চার অঙ্গুলি দ্বারা মুষ্ঠি বন্ধ করা দুই হাতে। চিত্র ২ এর

চিত্র -১

মতো। দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে ওঁকার ধ্বনি করা ৭ বার এবং শঙ্খধ্বনির শব্দ ডান কান থেকে শোনা, শ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হওয়ার সময় উড্ডিয়ান বন্ধ লাগানো। তারপর নিজ হাতের মুঠি বা মুদ্রা খোলার সময় কল্পনা করা ভয় এবং দুঃখ সব দূর হয়ে গেছে।

উপকারিতা :

(১) মানসিক অবসাদ (Depression) দূর হয়।

(২) উদাসীনতা দূর করে, সঠিক চিন্তা করায়।

(৩) আমাদের ভিতর নতুন উদ্যম তৈরি হয়।

(৪) আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

(৫) মানসিক রোগীর জন্য এই মুদ্রা অতি উত্তম। এই মুদ্রা করার পর হাত ও পা টানে তো আরও ভালো উপকার হবে।

বিঃ দ্রঃ— মানসিক কার্য অধিক যারা করেন তারা প্রত্যেক ঘণ্টা পর ১ গ্লাস জল খাওয়া উচিত। তাহলে মানসিক অবসাদ মিটবে।

স্বাস্থ্য সন্দেশ : দশটি সূত্র

১. প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করা। দৌড় ও সাঁতার কাটা খুবই ভাল ব্যায়াম। সপ্তাহে কমপক্ষে ১ দিন সারাশরীরে তেল মালিশ করা।

২. প্রতিদিন ৪/৫টি তুলসীপাতা খেলে জ্বরাদি রোগ হবে না।

৩. শান্ত ও প্রসন্ন থাকুন। কথা কম বলার অভ্যাস তৈরি করা, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বলা।

৪. দুশ্চিন্তা ক্ষতিকারক; কিন্তু সৎ চিন্তন-মননে বুদ্ধির বিকাশ হয়।

৫. রাত্রে ১ তোলা ত্রিফলা ১ পোয়া ঠাণ্ডাজলে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে নিয়ে পান করুন ও চোখ ধুয়ে নিন।

৬. বিছানার তোষক-বালিশ-চাদর মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিন।

৭. শোয়ার জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। ঘুম না আসা পর্যন্ত শোবেন না।

৮. ঘরের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য ধূপ-ধুনো, কর্পূর ও চন্দন ব্যবহার করুন। এতে ঘরের পরিবেশ পবিত্র হয়।

৯. ভাল সাহিত্য পড়ুন। অশ্লীল ও উত্তেজক সাহিত্য পড়লে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। অপরের ভাল গুণ গ্রহণ করুন।

১০. সব সময় মাথা ও পেট ঠাণ্ডা এবং পা গরম রাখুন।

কোন মুদ্রার দ্বারা কোন রোগ নিরাময় হয়

(১) ওজন কমার জন্য—সূর্য মুদ্রা

(২) সাইটিকা, সালিলাইটিস—বায়ুমুদ্রা।

(৩) হার্ট-এর রোগ—অপান বায়ুমুদ্রা।

(৪) মুধমেহ বা ডায়াবেটিজ—অপানমুদ্রা, প্রাণমুদ্রা।

চিত্র -২

(৫) সর্দি বা কফ—অগ্নিমুদ্রা।

(৬) দুর্বলতার জন্য—আকাশমুদ্রা।

(৭) নিদ্রা যাদের হয় না—জ্ঞানমুদ্রা, প্রাণমুদ্রা।

(৮) পচন ক্রিয়া—শঙ্খমুদ্রা, অপানবায়ুমুদ্রা।

(৯) ক্রোধের জন্য— ধ্যান মুদ্রা, শান্তমুদ্রা।

(১০) পায়ের হাঁটুর ব্যথা—বজ্রাসনে বায়ুমুদ্রা।

(১১) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য—অপানমুদ্রা।

(১২) শ্বাসকষ্টের জন্য বা সিড়িতে চলতে কষ্ট হলে—অপান বায়ুমুদ্রা।

ঝাড়গ্রামে শিশু সংস্কার কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ

ঝাড়গ্রামে শিশু সংস্কার কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বর্গ গত ১৫ থেকে ১৮ মার্চ ঝাড়গ্রাম শহরের কেডিয়া ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শিশু সংস্কার কেন্দ্রের সবিতা শতপতি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের উদ্বোধন করেন। মোট ২০টি কেন্দ্র থেকে ১৮ জন দিদিভাই এবং ২ জন দাদাভাই অংশগ্রহণ করেন। শিবির পরিচালনার জন্য খড়গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী, রাজকুমার ঝা, শিবদাস বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী পিউ গিরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ভোর ৪-৩০-এ জাগরণ থেকে রাত ১০-৩০ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ছিল।

এবারের প্রশিক্ষণের বিশেষ দিক ছিল হোমিওপ্যাথিক ও ভেষজ শিক্ষা। ডাঃ গোপাল কর প্রাকৃতিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং হোমিওপ্যাথির প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়া ভেষজের উপর প্রশিক্ষণ দেন পিউ গিরী। বাড়ীর আশেপাশের গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে রোগ সারানোর উপর জোর দেওয়া হয়। সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি সীতেশ ভট্টাচার্য প্রশিক্ষণ বর্গ পরিদর্শন করেন। সমগ্র কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন সমাজ সেবা ভারতীর সংগঠন সম্পাদক ধনঞ্জয় ঘোষ।

অর্ডন্যান্স ডিপো (আলিপুর) ইউনিয়নের জয়

গত ১২ মার্চ অর্ডন্যান্স ডিপো ওয়ার্কার্স কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সম্বন্ধিত সংগঠন ‘অর্ডন্যান্স ডিপো (আলিপুর) শ্রমিক ইউনিয়ন’ ৭টা সিটের মধ্যে ৭টা-তেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। মোট ভোটের ৫৩.৬৩২ শতাংশ ভোট অর্ডন্যান্স ডিপো (আলিপুর) পেয়েছে।

লোকায়ত সংস্কৃতির রক্ষাকবচ ইজেড সি সি

উত্তরপূর্ব ভারতের লোকায়ত তথা দেশজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরা ও তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার (ইজেড সি সি) বা পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলা, অসম, মণিপুর, সিকিম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই ৯টি রাজ্যের লোককলা-কৃষ্টি আজ দেশে-বিদেশে যে সমাদর পাচ্ছে তার মূলে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ ইজেড সি সি নির্ধারিত ও পরিচালিত বহুবিধ কর্মসূচি। সম্প্রতি এদের প্রশিক্ষণাধীন পুরুলিয়ার কচি-কাঁচা ছৌ-শিল্পীরা প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সর্বভারতীয় স্তরে বিশেষ পুরস্কার জিতে এসেছে। আর বিখ্যাত দুই চিত্রপরিচালক অশোক বিশ্বনাথন ও মানস ভৌমিক পরিচালিত ‘কোক থিয়েটার অব বোলে’ আর ‘লাসা ডান্সেস অব সিকিম’ জাতীয় চলচিত্রের আসর থেকেও জয়মাল্য নিয়ে এসেছে। এই দুটি ছবিই বলাবাহুল্য ইজেড সি সি প্রযোজিত। রাজা সেন, রাজা মিত্রর মতো যশস্বী পরিচালকও এই সংস্থার ব্যানারে বহু ছবি করেছেন। ভারতীয়ম্, ঐকতান দুটি অডিটোরিয়ামে নিয়মিত দেশী-বিদেশী ছবির প্রদর্শন ও উৎসব আর বাংলার সব গ্রুপ থিয়েটারের নিজস্ব প্রযোজিত নাটক এখানে অভিনীত হয়। হয় চিত্রপ্রদর্শনী, সাহিত্য সম্মেলন ও মননধর্মী সেমিনার আর সংস্থার অধিকর্তা অনুপ মতিলাল, দুই পি আর ও গৌতম মজুমদার ও দীপক মুখার্জি নেপথ্য চালক।

সমাবেশ সমাচার

মঙ্গলনিধি

গত ১০ মার্চ কোচবিহার জেলার সঙ্ঘের সদর মহকুমা কার্যবাহ অমর রায়ের শুভ-বিবাহ উপলক্ষে তার দাদা হেমন্ত রায় প্রবীণ প্রচারক পার্থ ঘোষের হাতে জেলার সেবাকাজের জন্য মঙ্গলনিধি হিসেবে অর্থদান করেন। জেলা প্রচারক অঙ্কুর সাহা সহ অন্য কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

মেদিনীপুর জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের খড়গপুর শাখার স্বয়ংসেবক রঘুবীর প্রসাদ গুপ্তা গত ১১ মার্চ পরলোকগমন করেছেন। ছিলেন সদাহাস্যময়, উৎসাহী স্বয়ংসেবক, সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধির জন্য তিনি সদাকর্মতৎপর। সেইসঙ্গে গোপালী আশ্রমের সেবাকাজে সক্রিয় সহযোগিতা করতেন। স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনীসহ বহু গুণমুগ্ধকে তিনি রেখে গেলেন।

***

শালবনী শাখার স্বয়ংসেবক আবাস তেওয়ারীর পিতৃদেব শ্যামসুন্দর তেওয়ারী পরলোকগমন করেছেন।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু’দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকুল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ‘‘চিঠিপত্র’’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না

— সঃ স্বঃ

নববর্ষে সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী

ছবিটি এঁকেছেন পর্ণা দাস, দ্বাদশ শ্রেণী, বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস।

বিগত কয়েকবছর যাবৎ সংস্কার ভারতী নববর্ষে সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশ করে আসছে। প্রতি বছরই একটা থিম থাকে। কখনও বাংলার ব্রতপার্বণ, কখনও বারোমাসে তেরপার্বণ। আবার কখন বাংলার থিয়েটার, যাত্রা বা শতবর্ষে 'ডাকঘর'। এবছর জগদ্‌পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধজন্মশতবর্ষ। স্বভাবতই এ বছরের বিষয় স্বামীজী। অর্থাৎ বারোমাসের বারোটি পৃষ্ঠায় থাকছে বিলে, নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দের জীবনের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা। স্থান পেয়েছে বিলের হুঁকো খাওয়া, গাছে উঠে ব্রহ্মদৈত্যের খোঁজ। নরেন্দ্রনাথের ঈশ্বরের খোঁজ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনান। পরিব্রাজক জীবনের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও আছে। বিশ্বধর্মমহাসভায় ভাষণ, লণ্ডনে মার্গারেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে নিয়ে বেলুড়ে দুর্গাপূজার সূচনা।

আর এসব ছবি এঁকেছে বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরের বিদ্যালয়ের ষষ্ঠশ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। আছে সুন্দরবন, সোনারপুর, নবদ্বীপ, বর্ধমানের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর ছবি। সেইসঙ্গে কলকাতা, হাওড়ার ছেলেমেয়েরাও পিছিয়ে নেই।

সংস্কার ভারতীর বক্তব্য, ছবিগুলো শিল্প সুষমার বিচারে হয়ত ততটা দৃষ্টিনন্দন নয় তবু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আগ্রহ, আন্তরিকতা— সেইসঙ্গে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখার মত। মোট পঁচিশজন ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নিয়েছে। সবচেয়ে ছোটজন ষষ্ঠশ্রেণীর আর সবচেয়ে বড়জন দ্বাদশশ্রেণীর। এদের উৎসাহ দেওয়া এবং স্বামীজীকে জানার আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সংস্কার ভারতীর এই প্রয়াস।

আগামী ৬ এপ্রিল ২০১৩, শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ঐতিহ্যমণ্ডিত শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে এই অভিনব দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ করবেন রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকেও— যাদের আঁকা ছবি নিয়ে ভরে উঠেছে বঙ্গাব্দ ১৪২০-এর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী।

সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ

একটি আবেদন

সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। গত ১১ বছর ধরে সমাজের গরীব মানুষের সেবায় রত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সমরসতা ও স্বাবলম্বনের কাজ করে চলেছে। ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। সমাজের এই সেবা কাজে প্রয়োজন প্রভূত অর্থ ও নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ লোকবল। তাই সকলের কাজে আবেদন করা হচ্ছে মুক্তহস্তে অর্থ দান করার জন্য এগিয়ে আসুন। স্নাতক যুবক-যুবতী ও অবসরপ্রাপ্ত পুরুষ-মহিলাদের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে আসুন, এই সেবাযজ্ঞে জীবনের কিছু সময় দান করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করে তুলি।

পোপের রোমান্স নিয়ে চলচ্চিত্র হতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কিছুকাল হলো বিশ্বের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সরকারি পোপ নির্বাচিত হয়েছেন ফ্রান্সিস (Francis)। আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো তাঁদেরও পূর্বাশ্রমের একটি নাম থাকে। সদ্য নির্বাচিত পোপ ফ্রান্সিসের পূর্বনাম জর্জ ম্যারিও বারগোগোলিও। পূর্ব নাম থাকলে একটি পূর্ব জীবন বা অতীতও থাকে। সংবাদসূত্র অনুযায়ী সদ্য সর্ব বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হয়ে যাওয়া পোপের অতীত ছুঁয়ে ছিল নিষ্পাপ কৈশোরের রোমান্স। আর্জেন্টিনার ফ্লোর জেলার মেমব্রানিলা স্ট্রিটে ৫৩১নং-এ থাকতেন কিশোর জর্জ। আর কয়েকটি বাড়ী ছেড়েই ৫৫৫ নং-এ একই রাস্তার বাসিন্দা ছিলেন প্রায় একই বয়সের সুন্দরী কিশোরী আমালিয়া দামন্তে। গত মার্চ মাসের ১৪ তারিখের টিভিতে পোপকে দেখে আর নাম শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন আজকের ৭৭ বছরের শুভ্রকেশী। স্মৃতির সুবাস হাতড়ে আবেগতাড়িত দামন্তে সংবাদ সংস্থাকে জানালেন, এক পাড়ারই ছেলে-মেয়ে ছিলেন তাঁরা। অর্ধ শতাব্দীর বেশি কেটে গেলেও সেই স্নিগ্ধ বিকেলের কথাটা আজ যেন বাতাস কেটে তাঁর কাছে ফিরে আসছে। ১৯৪৮ না ৪৯ তা আর ঠিক মনে পড়ে না। আজকের পোপ তখনকার লাজুক জর্জ কাঁপা কাঁপা হাতে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি চিরকালীন প্রেমপত্র। সেই ১২ বছর বয়সেই সর্বত্যাগী হওয়ার শপথ নিয়েছিলেন তিনি। মিসেস দামন্তে জানাচ্ছেন, হৃদয় নিঙড়ানো চিঠিটির কথা যা তাঁর আজও মনে নাড়া দেয়। জর্জ লিখেছিল, ‘‘একদিন সে তাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে। আর যদি না আমালিয়া রাজী হয় তাহলে সে ধর্মযাজক হয়ে যাবে।’’ হায়! আজ তার কথা এত সর্বালঙ্কার ভূষিত হয়ে যে সত্য হবে তা তিনি ভাবতে পারেননি। আমালিয়া দামন্তে সেই ১৯৪৮ সালের থেকে বেড়ে ওঠা বাড়িটিতে বসেই বলেছিলেন, তিনি জানতেন

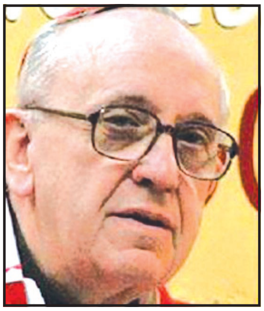

ফ্রান্সিস

আমালিয়া দামন্তে

ওই কৈশোরবেলায় বা তারপরেও তাঁর অভিভাবকেরা এ ব্যাপারে মত দেবেন না। তাঁদের মধ্যে ছিল কিছুটা সামাজিক ফারাকও। আজকের পোপের বাবা ছিলেন রেলকর্মী। সাত-পাঁচ ভেবেই অনিচ্ছায় কিশোর-প্রেমের বীজটিকে অকাল মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিয়েছেন আজকের বৃদ্ধা। স্মৃতিচারণ করে বলছেন, ‘‘বুয়েনস আয়ার্সের এই রাস্তার ওপরেই আমরা একসঙ্গে খেলতাম। এই পাড়াটা ছিল কী আশ্চর্য নির্জন। আমি হলফ করে বলতে পারি জর্জ (পোপ ফ্রান্সিস) আমার জন্য পাগল ছিল’’ (গলা ধরে আসছিল বৃদ্ধার)। সাক্ষাৎকারে আরও চাঞ্চল্যকর জীবনসত্য শুনিয়েছেন দামন্তে। তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর বিয়েতে জর্জ যেন অন্তত উপস্থিত থাকে। হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই ছিলেন, তবে বিয়ের পাত্র হিসেবে নয়, পুরোহিত হিসেবে। দেখে শুনে মনে হয় পোপের এমন মন ছোঁয়া রোমান্স অবলম্বনে চলচ্চিত্রের জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যার (১৪২০ বঙ্গাব্দ)

উন্মোচন অনুষ্ঠান

১৩ এপ্রিল, ২০১৩, শনিবার, বিকাল ৫.৩০ মিনিট

স্থান — কেশব ভবন

৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ

রাম ও রামায়ণের সর্বশেষ সামগ্রিক

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

বিমান বিহারী রায়ের

রামায়ণ যখন ইতিহাস

মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

তুহিনা প্রকাশনী

১২সি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০৭৩

মোবাইল ঃ ৯৭৩৩৫৭৭৪৩৪

পাতাল গহ্বরে ভারতীয় হকি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুলতান আজলান শাহ টুর্নামেন্টেও ভাগ্য পরিবর্তন হলো না মাইকেল নবসের। অস্ট্রেলিয়া থেকে নামীদামি কোচ এনেও কোনও লাভ হচ্ছে না। বিদেশী কোচ, বিদেশী ফিজিক্যাল ট্রেনার, রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ অথচ ভারতীয় হকি বিশ্বের সব টুর্নামেন্টে ব্যর্থতার ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে। গত বছর লন্ডন

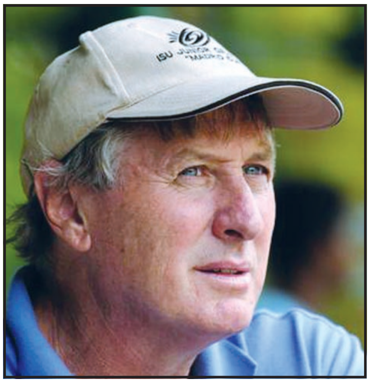

নবস্

অলিম্পিয়াডে সর্বশেষ স্থানটি জুটেছিল। যা দেখে লেসলি লডিয়াস বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ে শেষমেশ ধরাধাম থেকেই বিদায় নেন। স্বর্গলোকে ধ্যানচাঁদ, বাবুদের আত্মা কি কষ্টই না পাচ্ছে! যে ভারত কিনা দুনিয়াকে হকি খেলা শিখিয়েছে আর পঞ্চাশ বছর ধরে প্রায় প্রতিটি অলিম্পিকে কিংবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে জয়যাত্রা ধরে রেখে এক অন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেছে হকিকে। আর আজ সেই দেশকে বিদেশী কোচ, ট্রেনারের মুখাপেক্ষী থাকতে হচ্ছে অথচ তাতেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কেন এমন হচ্ছে, কেন কোনও দিশা দেখা যাচ্ছে না? আসলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রাজনীতিই ভারতীয় হকিকে শেষ করে দিচ্ছে। দুটো সমান্তরাল সংস্থা এখন এদেশের হকির নিয়ন্ত্রক। একটা ট্রাডিশনাল ভারতীয় হকি ফেডারেশন বা আই এইচ এফ, আর একটা হকি ইন্ডিয়া; আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা হকি ইন্ডিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আই ও সি হকি ফেডারেশনকে। দুই সংস্থার টানাপোড়েনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খেলোয়াড়রা। যেহেতু সরকার হকি ইন্ডিয়ার পক্ষে তাই যেসব কোচ ও খেলোয়াড় ফেডারেশনের প্রতি অনুরক্ত তাদের জাতীয় দলের থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এর উজ্জ্বল উদাহরণ রাজপাল সিং। অসাধারণ এই স্কিলফুল ফরোয়ার্ড গত দুবছর ধরে দলের বাইরে। একটু স্লো হলেও রাজপালের স্কিল ও ভেদশক্তি এখনও শাণিত। ইউরোপীয় দেশগুলি বা অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্ডাররা রাজপালকে একটু বেশিই সমীহ করে।

আর একজন হলেন ডিফেন্ডার সন্দীপ সিং। শর্ট কর্নার বিশেষজ্ঞ ডিফেন্সকেও নির্ভরতা দেন। অলিম্পিকের পর কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ছেঁটে ফেলা হয়েছে তাঁকে। এই প্রজন্মে রাজপাল, সন্দীপ প্রকৃতই বিশ্বমানের খেলোয়াড়। একে প্রতিভার আকাল, তার ওপর যারা সব অর্থেই বড় মঞ্চের খেলোয়াড় তাদের বাদ দিয়ে দল গড়লে যা হবার তাই হচ্ছে। যে আজলান শাহ ভারতের সবচেয়ে পয়মন্ত টুর্নামেন্ট, সেখানেও ৬ দলের মধ্যে পঞ্চমস্থান জুটেছে। তাহলে এত ঘটা করে হকির পেশাদার লিগ করে কি লাভ হলো? সব দেশ থেকে বড় বড় খেলোয়াড়রা এসে খেলে গেল এই লিগে অথচ ভারতীয় খেলোয়াড়দের মানের এতটুকু উন্নতি দেখা গেল না।

সাহারা ইন্ডিয়ার মতো স্পনসর, টিভিতে নিয়মিত খেলা দেখানো, বিদেশে নিয়মিত এক্সপোজার। খেলার মান কিন্তু সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। আগে বিদেশে সিনিয়র দল ব্যর্থ হলেও জুনিয়ররা কিন্তু সাফল্য এনে দিয়েছে। যেমন ১৯৯৭-এ যুব বিশ্বকাপে রানার্স হবার পর ২০০১-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে 'অনূর্ধ্ব ২০' ভারতীয় দল। সেই দল থেকে উঠে এসেছিল গগন অজিত সিং, দীপক ঠাকুর, নভজ্যোত সিংহের মতো কুশলী খেলোয়াড়রা। তাঁরা সিনিয়র পর্যায়ে এসে ভারতকে গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে টেনে তুলতে পারেননি। তবে তারজন্য কে পি এস গিলের দায়িত্বজ্ঞানহীন নানা কাজকর্মকে দায়ী করতে হবে। ভাল ভাল খেলোয়াড়কে গিল কখনই

কে পি এস গিল

স্বাভাবিক ছন্দে পারফর্ম করতে দেননি। সবসময় মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখেছেন। একটু খারাপ খেললেই দল থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ওই জুনিয়র টিমের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তৎকালীন সিনিয়র তারকাদের সমন্বয় গড়ে তুলতে দেননি। এসব না হলে এই শতাব্দীর গোড়া থেকে অন্যমাত্রা ও মানে উপনীত হোত ভারতীয় হকি আর সেই উন্নত ধারাটা এখনও বজায় থাকত।

পরিবর্তে ফেডারেশন কর্তারা, বিশেষ করে গিল দায়িত্ব নিয়ে উঠে আসার পথটা বন্ধ করে দিলেন। একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম হতে গিয়েও হলো না। এক ঝাঁক স্কিলফুল, গতিশীল আধুনিক হকির সঙ্গে মানানসই খেলোয়াড় উঠে এসেছিল ২০০১ যুব বিশ্বকাপ থেকে। তাঁদের ঠিকমত পরিচালনা ও লালন করলে পাঁচ-সাত বছর পর সুফল পাওয়া যেত। বেজিং অলিম্পিকে খেলার টিকিট না পাওয়া কিংবা পরবর্তী লন্ডন অলিম্পিকে ছাড়পত্র পেয়েও শেষ স্থান প্রাপ্তি এসব হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখতে হোত না।

শব্দরূপ-৬৬৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	■	৩		৪
■	■	৫	৬			■	
■	৭	■		■	■	■	
■	৮			■	■	৯	
১০		■	■	১১			■
	■	■	■		■		■
	■	১২			১৩	■	■
১৪			■	■	১৫		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. খালি হাতে আত্মরক্ষার চীনদেশীয় পদ্ধতি বিশেষ, ৩. বেগুন, ৫. রক্তপদ্ম, ৮. ভূমিতে বিন্দু পাতাদি দ্বারা ভবিষ্য কথন, ৯. এর উপর খাঁড়ার ঘা মানে গুরুতর আঘাতের উপর পুনরায় আঘাত, ১০. উপবন, লতাগৃহ, ১১. দশরথের মন্ত্রী ও সারথি, ১২. শত্রুকে যে নিগৃহীত করে, ১৪. রঙ্গকারী, ফুর্তিবাজ, ১৫. মহাভারতোক্ত মহানদী বিশেষ; পুরাণে বরুণপত্নী বলে উল্লিখিত।

উপর-নীচ : ২. দুগ্ধ নিঃসরণের জন্য গোরুর যোনিতে ফুঁ; কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ দোহন, ৩. বর্জন, ৪. আয়ুর্বেদে উক্ত ঔষধের জন্য প্রয়োজনীয় গাছ বিশেষ, ৬. সাংখ্য দর্শনকার মুনি, ৭. এক প্রকার ফল বা গাছ; প্রথম দুয়ে হাত, ৯. পরামর্শ, ১০. যে ব্যক্তি কুলের কলঙ্কস্বরূপ, ১১. 'রানার'—কবি, ১২. তেল তুলবার জন্য লম্বা হাতলযুক্ত ছোট বাটি, ১৩. এক প্রকার বিদেশী সঙ্গীত।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৬০
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	প	র	মা	দ	র	■
■	■	■	স	■	■	বা	■
কৃ	পা	■	ক	ষ্ঠি	ধা	র	ণ
■	ন	ই	লি	■	র্মি	■	■
■	■	ল	■	ব	ক	না	■
ক	ন	কা	ঞ্জ	লি	■	গ	য়
■	মু	■	■	দা	■	■	■
■	চি	ন্তা	জ	ন	ক	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৬৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ এপ্রিল, ২০১৩ সংখ্যায়

খৃষ্ট ধর্মের শেষ বিচারের দিন-এর ন্যায় কোন বস্তু হিন্দুধর্মে নাই। হিন্দুদের ঈশ্বর শাস্তিও দেয় না, পুরস্কৃতও করেন না। কোন প্রকার অন্যায় করিলে তাহার শাস্তি অবিলম্বে স্বাভাবিকভাবেই ঘটিবে। যতদিন না পূর্ণতা লাভ হইতেছে, ততদিন আত্মাকে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ
(বাণী ও রচনা, ১০/৮৪)

সৌজন্যে : জনৈক শুভানুধ্যায়ী

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নেপথ্য কাহিনী

প্রদীপ্ত দত্ত

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতকে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে হয়। সামনাসামনি এইসব যুদ্ধে পরাজয়ের পর আশির দশকের পর থেকে পাকিস্তান তার যুদ্ধ কৌশল বদলায়। ভারত অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর থেকে তরুণ কাশ্মীরীদের পাকিস্তান দখলীভূত কাশ্মীরে প্রশিক্ষণের জন্য আনা হতে থাকে। এদের দিয়েই কাশ্মীরে উত্তেজনা, হিংসা ও একপ্রকার ছায়াযুদ্ধ চালানো হয়। এর নিয়ন্ত্রণ ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল, সেনাবাহিনী ও ধর্মীয় সংগঠনের হাতে।

৭০-এর দশকের শেষলগ্নে পাকিস্তান আবার তার রণকৌশল পাল্টায়। যে যুদ্ধ এতদিন কাশ্মীর পেরিয়ে ভারতে ঢুকছিল তা ভারতের মাটি থেকে সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। একটি হবে রাজনৈতিক ও আর একটি সন্ত্রাস সৃষ্টির সংগঠন। আর এর নেতৃত্ব দেবে ভারতীয় মুসলিমরাই। সিমি আর ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের আবির্ভাব সেই পরিকল্পনার সাফল্য প্রমাণ করে।

পাকিস্তানের 'জামাত-ই-ইসলামী'র স্রষ্টা মৌলানা মওদুদি (১৯০৩-১৯৭৯) ইসলামিক মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ও সংগ্রামের শপথ নেয় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। ইসলামিক স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরতে হবে। সারা বিশ্বকে গড়ে তুলতে হবে ইসলামিক রাষ্ট্র (দার-উল-ইসলাম) হিসাবে।

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জোট বাধে মিশরের 'ব্রাদারহুড' দলের সঙ্গে, যারা এই মুহূর্তে মিশরে ক্ষমতায় এসেছে, পাকিস্তানে 'লস্কর তৈইবা', প্যালেস্টাইনের হামাম, বাংলাদেশের হুজির সঙ্গে।

১৯৯৯-এ আওরঙ্গবাদে সিমির প্রকাশ্য সভায় মহম্মদ আমীর সাকেল আহমদ জানালেন— ইসলাম আমার দেশ, ভারত নয়। এই বক্তব্যের এক দশকের মধ্যে ভারতের মাটিতে শুরু হলো সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ। শুরু হলো নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষের রক্তক্ষয়। যার শেষতম নিদর্শন ২০১৩ হায়দরাবাদের দিলখুশ নগরে সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণ।

হায়দরাবাদে বিস্ফোরণস্থল পরীক্ষা করছে পুলিশ।

যুদ্ধে অর্থ আসছে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম দেশগুলি থেকে। এই তথ্য দিচ্ছে ধরা পড়া ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সদস্য রিয়াজ ভাটকল। কিন্তু সৈন্য তৈরি হচ্ছে ভারতের মাটিতেই। এই নতুন ধরনের সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধের সূত্রপাত ২০০৪-এ হায়দরাবাদের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। ২০০৪-এ ১৩ মে বিস্ফোরণ হয় জয়পুরে, মৃত্যু হয় আশি জনের, হতাহতের সংখ্যা দু-শোর উপর।

২০০৪-এর ২১ জুলাই বিস্ফোরণ হয় আহমদাবাদে। হতাহতের সংখ্যা ২০০। এরপর ব্যাঙ্গালোরে মৃত্যু হয় এক জনের, আহত ছয়। ২০০৪-এর ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বিস্ফোরণ হয়। আহতের সংখ্যা

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

নব্বই, মৃত্যু হয় ত্রিশ জনের। পরের মাসেই গুয়াহাটিতে বিস্ফোরণ হয়। মৃত্যু হয় তিরাশি জনের, আহত হয় তিন শ' উপর।

দেশের মধ্যে এই ব্যাপক হত্যালীলা সংগঠিত করে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। ভারতের মধ্যেই এক শ্রেণীর মুসলিমদের সংগঠিত

কেয়ামুদ্দিন কাপাড়িয়া

প্রচেষ্টা ছাড়া এই ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড চালান সম্ভব নয়।

কিন্তু কারা এই সংগঠন গড়ে তুলল। আর কীভাবেই বা এত শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হলো?

এই সংগঠন গড়ে তোলার মূল সদস্যরা হলো কেয়ামুদ্দিন কাপাডিয়া, উসমান আসগর বাতিওয়ালা, সাজিদ মনসরি। ২০০৭-এ কেরালার অলিভাতে ৫০ জনের মতো সিমি সদস্য জেহাদী ট্রেনিং নেয়। যে ট্রেনিং এতদিন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে হোত, তা ভারতের মাটিতে করা সম্ভব হলো। এই আন্দোলনে ভারতের দুই ধরনের তরুণ মুসলিমদের সংগঠিত করা হলো। একদল উচ্চশিক্ষিত আর একদল অশিক্ষিত ও দরিদ্র শ্রেণির মুসলিম। এরা অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসমের। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নেতৃত্ব স্থানীয়দের মধ্যে প্রধানতম হলো 'আবদুল সুভান উসমান কুরেশী। ছদ্মনাম কাশিম অথবা আলি আরবি। পড়াশুনা অ্যান্টনিও ডিসুজা উচ্চবিদ্যালয়ে, ভারতীয় বিদ্যাপীঠ, ইন্ডাসট্রিক্যাল ইলেকট্রনিকসে ডিপ্লোমা ও সফটওয়ার মেনটেন্যান্স নিয়ে স্পেশালাইজেশন। ২০০১-এ সিমি, তারপর ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে যোগ। আনয়ার আলি

সাজিদ মানসারি

রিয়াজ ভাটকল

বাগবান এম বি বি এস গ্রাজুয়েট এবং হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের মূলচক্রী। ধরা পড়ার পর সে জানায় এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের অধিকাংশ মুসলিম তরুণই সফটওয়ার স্পেশালিস্ট যারা আবার বিস্ফোরক বানাতেও বিশেষজ্ঞ।

মহম্মদ মনসুর অসগর পীরভাই, মুবিন কাদের শেখ হ্যাকার স্পেশালিস্ট। যারা WI-FI কানেকশন হ্যাক করে নেয়। উত্তরপ্রদেশের আই এম সদস্য কায়িম আরশাদ আনসারি, হায়দরাবাদের সামি আহমেদ লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার মূল কাণ্ডারি। আনসারি লস্কর-ই-তৈবার কাছ থেকে ট্রেনিং নেয়।

সেখান থেকেই গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ট্রেনিং পদ্ধতি। যেমন 'দওরা আম' (Bssic compact cowise) 'দওরা খাস' (Specialized guewrsilla function), সেইসঙ্গে যুগলম্যাপ, কম্পাস ও জিপিএস ট্রেনিং।

মুম্বাই-এর তাজ হোটেলে আক্রমণ থেকে সংসদ আক্রমণ এবং অসমের দাঙ্গাতেও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নাম উঠে আসে। ২০১২-তে আগস্ট মাসে পুনেতে বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের মূলে চার ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ছবি প্রকাশ করে এ টি এস। সদ্য ঘটা হায়দরাবাদের দিলখুসনগরে বিস্ফোরণে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মূল পাণ্ডা রিয়াজ ভাটকলের নাম উঠে আসে।

এই নতুন ধরনের ছায়া যুদ্ধ ভারতের ভূমিতে বাড়ছে। অনবরত রক্তক্ষয় হচ্ছে। যে যুদ্ধের সূত্রপাত হাজার বছর আগে তার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এখনও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভারতকে।

ঋণ স্বীকার :

1. Institute for defence studies and analyses.

2. Namrta Goswami, 'Back Grounder.'

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
1 April - 2013

FOR INTERIORS
THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

দাম : ৭.০০ টাকা